হযরতজি মাওলানা ইউসুফ রাহ.
মাওলানা সাঈদ আহমদ খান রাহ.

তাবলীগ জামাত

পরিচিতি, মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি



তাবলীগ জামাত

পরিচিতি, মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি

হাফিয মাওলানা ফখরুযযামান

তাবলীগ জামাত
পরিচিতি, মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি
সঙ্কলন
হাফিয মাওলানা ফখরুযযামান
জামেয়া ইসলামিয়া ফরিদাবাদ সিলেট
স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশকাল
জুলাই ২০১২ ইসায়ি
রামাযান ১৪৩৩ হিজরি
কম্পোজ
মুহাম্মদ আবদুল কাদির
প্রচ্ছদ ও ছাপা
সৃজনী প্রিন্টার্স
সিটি বাণিজ্যিক ভবন, বন্দরবাজার, সিলেট।
পরিবেশনায় ——————————
মাকতাবাতুলমা'আরিফ
৫/২, হাজি কুদরতউল্লাহ মার্কেট (নিচতলা)
বন্দরবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ। ফোন: ৭২০৭০৮
মোবাইল: ০১৭৩৮ ৬২০৬০১, ০৭৮৩১ ৩৫৩৫২৫
মূল্য: ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

TABLIG JAMAT: by: Hafiz Mawlana Fakhrujjaman. Computer Edit by: Abdul Kadir. Printed by: Sreejoni Printer's, Sylhet. Published by: Maktabatul Ma'rif, Hazi Kudratullah Market, Sylhet, Bangladesh-3100. 1st Edition: june 2012. Price Tk 150 Only.

উৎসর্গ

যুগে যুগে যাঁরা দওয়াত ও তাবলীগের কাজে
নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, দিচ্ছেন এবং দিবেন।
যাঁদের রক্ত ঘামে আজও দ্বীন টিকে আছে
এবং টিকে থাকবে কিয়ামত অবধি–
তাঁদের সবার উদ্দেশে।

এক নজরে- যা আছে ভিতরে

পাঠকদের বরাবরে কিছু কথা

এক.

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জামেয়া ইসলামিয়া ইউসুফ বিননুরি টাউন, করাচি, পাকিস্তানের পরিচালক ড. মাওলানা আবদুর রাযযাক ইসকন্দর সাহেব সিলেট সফরে আসলে হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করি। ফেরার সময় তিনি হাদিয়া হিসাবে তাঁর লিখিত দুটি বই দেন। এর একটি ছিল تبلیغی جماعت اور اس کی دعوت کے اصول وآداب (তাবলীগ জামাত ও এর দাওয়াতের উসূল ও আদাব)। ওই রাতে ঘরে ফিরেই বইটি পড়তে আরম্ভ করি। বইটি পড়ে খুবই উপকারী মনে হল। তাই পরদিনই অনুবাদে হাত দেই। কম সময়েই অনুবাদ শেষ হল। প্রুফ দেখাসহ যাবতীয় কাজ শেষ। ছাপাতে দেব। এমন সময় তাবলীগ জামাত সম্পর্কিত বিভিন্ন বই হাতে আসতে থাকে, অধ্যয়নও চলতে থাকে। আর নতুন নতুন বিষয় বইটিতে সংযোজন করতে থাকি। এখন আর বইটি অনুবাদ গ্রন্থ নয়, বরং তাবলীগ জামাত সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বইয়ের সংক্ষিপ্ত সার বলা যায়। তবে যেহেতু মূলত ড. আবদুর রাযযাক সাহেবের বইয়ের অনুবাদ হিসাবে কাজ শুরু হয়েছিল, তাই তাঁর বইয়ের ভূমিকা ও তাবলীগ জামাত সম্পর্কিত তাঁর মন্তব্য হুবহু রাখা হয়েছে।

দুই.

এ বইটিতে তাবলীগ জামাত সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের আলোচনা পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে।এতে যেমন রয়েছে বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনি ব্যক্তিবর্গের প্রশংসামূলক মন্তব্য, তেমনি রয়েছে স্বপক্ষীয় লোকদের কল্যাণমূলক পর্যালোচনা। যা জগৎব্যাপী এ ঈমানি তাহরিককে পূরা উম্মতে মুসলিমার মধ্যে ভাইভাইসমূহের লেনদেনের জন্য সেতু-বন্ধনের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি। তবে একটি আবদার, দ্বীনের সার্বিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকদেরর ন্যায় বইটির কিছু অংশ পড়ে যেন, উলামা সমাজের প্রতি ভুল ধারণা ও তাঁদের সাথে সম্পর্কের অবনতির কারণ না ঘটে। তাঁদের ব্যাপারে কোনো বিরোপ মন্তব্যও যেন না করি, যা আমাদের সাধারণ অভ্যাস। কারণ এ বইয়ে যাঁদেরই আলোচনা পেশ করা হয়েছে এঁদের সবাই আগাগোড়া দাওয়াতের এই আযীম মেহনতের সাথে জড়িত ছিলেন ও আছেন। এঁরা তাবলীগ জামাতের খয়েরখাহ ও কল্যাণকামি। তাঁরা সবাই চান এ মেহনতটি রাসূলে আকরাম সা. ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি.দের অনুসরণের পথে অটুট থেকে সঠিকভাবে পরিচালিত হোক। আর এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞ আলিমদের সস্নেহ-সতর্কীকরণ। যা সর্বকালে হক্কানি উলামায়ে কেরাম করে আসছেন। পাকিস্তানের মুফতী যায়নুল আবিদীন সাহেব রাহ. বলতেন, আদাওতে উলামা হলো উলামাদের কাছে দৈনন্দিন বিষয়সমূহ তাহকিক না করে চলতে থাকা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হক বুঝার তাওফিক দিন। আমীন।

তিন.

দ্বীনের যে কোনো মেহনতে যখন সময় অতিবাহিত হয় ও ব্যাপকতা আসে তখন ধীরে ধীরে এতে বিভিন্ন ধরণের অসঙ্গতি সৃষ্টি হতে পারে। তাই সঠিক সময়ে আহলে হক উলামায়ে কেরাম শক্তভাবে সঠিক পথের দিকে রাহবরি না করলে যা গোমরাহী ছড়ানোর মাধ্যম হয়ে ওঠে। এ আশঙ্কাটি হযরতজি ইলয়াস রাহ. আপন জীবদ্দশায়ই দাওয়াতের এ কাজের ব্যাপারেও করে গেছেন। তাই দেখা যায় দ্বীনের কোনো খাটি মিশন চালু হলে উলামায়ে কেরাম, এর পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করতে থাকেন; যাতে মিশনটি সঠিকভাবে টিকে থাকে। যে মেহনতে এ সুযোগ নেই তা ধীরে ধীরে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে গোমরাহী ছড়ানোর কারণ হয়ে যায়- যা কারো কাম্য নয়। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকায় অনেকে এ ধরণের পর্যালোচনাকে বিরোধীতা মনে করে বিরূপ মন্তব্য করতে আরম্ভ করেন। যা মোটেই সমীচীন নয়। এ ধরণের পর্যালোচনার সুযোগ তাবলীগ জামাতের বড়দের কাছে সূচনা থেকেই ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষতেও থাকবে। আর থাকাও জরুরি। অতএব সঠিক কথা স্মরণ করিয়ে দেনেওয়ালাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। মূলত এরাই আসল বন্ধু, কল্যাণকামি ও খয়েরখাহ।

চার.

রাহবরে কওমের প্রতি আবেদন

'তাবলীগ জামাত' নামে বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ও তাবলীগের যে মিশন আজ চালু রয়েছে, তা দ্বীনের কোনো আংশিক খেদমত নয়; বরং দ্বীনের সার্বিক বিষয়ে মেহনতের লক্ষ্যে মূলত এ মিশনের সূচনা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর চালু করা সেই মিশন যাঁদের মাধ্যমে সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল, যাঁদের দিকনির্দেশনা ও রাহবরিতে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার কথা—তাঁরা সঠিক সময়ে এ মেহনতের বাগডোর নিজেদের হাতে না নেওয়ায় আজও এ মেহনতের ফলাফল কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে প্রকাশ পাচ্ছে না। এরপরও এ মেহনতের বদৌলতে বিশ্বব্যাপী দ্বীনের যে ঢেউ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা এর প্রাথমিক পূর্বাভাস। এখনোও যদি এ মিশনের দায়িত্ব উলামায়ে কেরাম নিজেদের হাতে নিয়ে মসজিদভিত্তিক দ্বীনি মেহনতের প্রচেষ্ঠা চালান, যেভাবে নবী করীম সা. এর যুগে মসজিদভিত্তিক দ্বীনি মেহনত চালু ছিল। তাহলে আজও সমাজ পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু আজ দ্বীনের মেহনতের ক্ষেত্রে সবাই অংশ বিশেষ নিয়ে পরিতৃপ্ত। আর ব্যাপক খেদমতের মিশনটি আমরা সাধারণ মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়ে দূর থেকে অভিযোগ করয়ী। এটা কিন্তু এর সঠিক সমাধান নয়, বরং আমাদেরকে এগিয়ে এসে এর দায়িত্ব নিতে হবে; যাতে একই সাথে তালীম, তারবিয়াত ও তাযকিয়ার মেহনত করা যায়। প্রতিটি মাদরাসা, প্রতিটি খানকা যেন গড়ে ওঠে এক একটি দাওয়াতের মারকায হিসাবে। দাওয়াত ও তাবলীগ ছাড়া আর কোনো দ্বীনি মিশন কি আজ বিশ্বব্যাপী এমন বিস্তৃত?

আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনি এ মেহনতে শরীক হওয়ার তাওফিক দিন। আমীন।

— লেখক

মে ২০১২

সূচি

ভূমিকা

الحمد لله الذي بعث الأنبياء والرسل لهداية العباد، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد ختم الأنبياء والرسل، أرسله بالهدى ودين الحق، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد،

১৯৮৪ সালের কথা। করাচি এয়ারপোর্টে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশের ওয়াকফমন্ত্রীর সাথে দেখা।ভদ্রলোক পাকিস্তান ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত 'সীরাত কনফারেন্স'-এ যোগ দিতে ইসলামাবাদ যাচ্ছেন। ওই মন্ত্রীর সাথে এয়ারপোর্টেই দ্বীনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে। ঘটনাচক্রে হলেও মূলত আল্লাহর হুকুমে ফ্লাইট দেরি করে। এতে আমাদের সাক্ষাৎও দীর্ঘ হয়। ফলে মন্ত্রীর সাথে বেশ ভাব জমে ওটে। এক পর্যায়ে মন্ত্রী বললেন, 'আপনি কি তাবলীগ জামাত- যার মারকায হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে রয়েছে- সম্পর্কে কোনো তথ্য দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করতে পারবেন'?

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এও বললেন, এ জামাত সম্পর্কে আপনি নিজের মতামত জানালেও খুশি হব। এরই সঙ্গে তিনি একমাস পর তার দেশে অনুষ্ঠিতব্য 'ইসলামি কনফারেন্স'এ শরীক হওয়ারও দাওয়াত দেন। আমি দাওয়াত কবুল করে বললাম, 'ইনশাআল্লাহ, কনফারেন্সে আসার সময় আপনার কাঙ্ক্ষিত বিষয় নিয়ে আসার চেষ্টা করব'।

এর পর আমি করাচির তাবলীগ জামাতের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করলাম। তাঁদের কাছে যদি তাবলীগ জামাত সম্পর্কে আরাবী ভাষায় লিখিত কোনো কিছু থাকে তাহলে সাথে নিয়ে যাব এবং তা আরব ভাইদের সামনে পেশ করব। কিন্তু জামাতের যিম্মাদার হযরাত এমন কোনো কিছু থাকার ব্যাপারে তাদের না জানার কথা বললেন। কারণ তাবলীগ জামাত সম্পর্কে যা কিছু লিখিত, এর বেশিরভাগই উর্দূতে। তাই আমি নিরাশ হয়ে গেলাম।

আমার রওয়ানা হওয়ার মাত্র দু'তিন দিন বাকি। এমন সময় আমাদের মহল্লা -বিননুরি টাউন-এর তাবলীগ জামাতের আমীর ভাই নাযীর সাহেব আমার কাছে তাবলীগ জামাতের সাবেক আমীর 'হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রাহ. এর বিরাট একটি চিঠির ফটোকপি নিয়ে এলেন'। এটি তিনি এমন এক জামাতের উদ্দেশে লিখেছিলেন— যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছিল;

এ লম্বা চিঠিতে হযরতজি 'তাবলীগ জামাতের কাজের মূলনীতি, কর্মপদ্ধতি, রূপরেখা ও ছয় নম্বর' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেগুলোকে তাবলীগ জামাত আপন মিশনের বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ, এ দীর্ঘ চিঠি পাওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি হলাম। মনে মনে বললাম, মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কৃত

ওয়াদা অন্তত পূরা করা যাবে। সম্ভবত দ্বিতীয় দিন ছিল আমার সফর। বিমানে আরোহণ করেই আমি এ চিঠির আরাবী অনুবাদ শুরু করি। আল হামদুলিল্লাহ, বিমান যখন মনযিলে গিয়ে পৌঁছে তখন আমি অনুবাদ শেষ করে নিয়েছি।

যেহেতু মন্ত্রী মহোদয় তাবলীগ জামাত সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামতও চেয়েছিলেন, তাই আমি আমার জানা-শোনা এবং তাবলীগ জামাতের যিম্মাদার হযরাতের বয়ানের আলোকে নিজের মতামতও লিখে নেই। মন্ত্রীর সাথে দেখা হলে আমি আপন ওয়াদা অনুযায়ী এগুলো পেশ করি। এতে তিনি খুশি হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন।

সফর থেকে ফিরে আসার পর মনে করলাম, এ চিঠিটি বই আকারে ছেপে দিলে ভালো হয়। কারণ যেসব সাথী এ কাজে লেগে রয়েছে তাঁরা এটি পড়ে বসীরত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে পারবে। তাই এটি বই আকারে ছেপে দিই। আরবের সাথীরা বইটিকে খুবই পছন্দ করে। দুআ দেয়। এ পর্যন্ত এর ষষ্ঠ এডিশন মুদ্রিত হয়েছে।

হযরতজির উর্দূ চিঠিটি কিতাব আকারে না হওয়ায় এটি তার জীবনীর সাথে ছাপা হয় ঠিক, তবে তা অনেকেরই অজানা।

আরাবী অনুবাদ ছাপার পর কেউ কেউ এ মর্মে পরামর্শ দেন, 'যদি উর্দূ চিঠিটিও কিতাব আকারে ছেপে দেওয়া হয় তাহলে উর্দূভাষী হযরাত যারা এ কাজে জড়িত- তাঁদের অনেক উপকারে আসত, তাঁরাও অনেককিছু জানতে পারত'।

এ পরামর্শের ভিত্তিতেই এবার উর্দূ চিঠিটি কিতাব আকারে ছাপানো হল। আশা করি এর ফায়দা ব্যাপক ও আম হবে।

আল্লাহ তাআলা এ খেদমতকে কবুল করুন এবং তা সকলের জন্য উপকারী বানান। আমীন।

ড. আবদুর রাযযাক ইসকন্দর
করাচি, পাকিস্তান

১৬-১৮

তাবলীগ জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তারা শুধু নামেই মুসলমান। তারা জানে কেবল ইসলামের নাম। কিন্তু 'কালেমাটি' পর্যন্ত বলতে পারে না। তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সহীহভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। অর্থ তো পরের কথা।............

মুসলমানদের এ করুণ অবস্থা দেখে হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর খুবই কষ্ট হয়। মুসলমানদের এ দ্বীনহীন অবস্থা তাঁকে পীড়া দেয়। কেঁদে ওঠে তাঁর নরম মন। তিনি চিন্তা করতে থাকেন, কেমন করে মুসলমানদেরকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করা যায়? তাদের ঈমান-আমল কিভাবে হেফাযত করা যায়? কোন লাইনে মেহনত করলে মুসলমানরা মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকবে?............

আল্লাহ তাআলা তাঁর এ প্রিয় বান্দার ওই কাজে বরকত দেন ও তা এমনভাবে কবুল করেন যে, যা একটি বস্তি ও গ্রাম থেকে শুরু হয়েছিল তা তরক্কি ও উন্নতি করতে করতে আজ আন্ত র্জাতিক এক দাওয়াতি মিশনে পরিণত হয়েছে। সকল দেশ ও সকল অঞ্চলের মানুষ আজ এ কাজকে গ্রহণ করে নিয়েছে।............

তাবলীগ জামাতের

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শতাব্দীকাল পূর্বের কথা। ভারতবর্ষে একজন মহান বুযুর্গ ও অনেক বড় এক আলিম ছিলেন। নাম তাঁর মাওলানা ইলয়াস। তিনি যখন একটু হুশমন্দ ও বুঝদার হয়ে দেখতে পান মুসলমানদের অবস্থা খুবই নাজুক। একদিকে গরীব অপরদিকে দ্বীনি ব্যাপারে গাফেল। ভারতবর্ষের কোনো কোনো এলাকার মুসলমানদের অবস্থা তো এমন—তারা শুধু নামেই মুসলমান। তারা জানে কেবল ইসলামের নাম। কিন্তু 'কালেমাটি' পর্যন্ত বলতে পারে না। তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সহীহভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। অর্থ তো পরের কথা।

মুসলমানদের এ করুণ অবস্থা দেখে হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর খুবই কষ্ট হয়। মুসলমানদের এ দ্বীনহীন অবস্থা তাঁকে পীড়া দেয়। কেঁদে ওঠে তাঁর নরম মন। তিনি চিন্তা করতে থাকেন, কেমন করে মুসলমানদেরকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করা যায়? তাদের ঈমান-আমল কিভাবে হেফাযত করা যায়? কোন লাইনে মেহনত করলে মুসলমানরা মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকবে? কোন পদ্ধতিতে তাদের সংশোধন ও ইসলাহের কাজ আরম্ভ করা যায়? তা নিয়ে তিনি দিন-রাত চিন্তা করতে থাকেন। ফিকির করতে থাকেন। দিন যায়, রাত যায়, তাঁর চিন্তা শুধু বাড়তে থাকে। তাঁর পেরেশানি শুধু বাড়ছে আর বাড়ছে। তিনি বেচাইন হয়ে পড়েন। আল্লাহর দরবারে কাঁদেন। রোনাজারি করেন। আর আল্লাহকে বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তোমার হাবীবের উম্মতকে রক্ষা করো। তাদের হেফাযত করো। পথহারা এ উম্মতকে আবার সঠিক পথে চালাও। তাদেরকে দ্বীনের বুঝ দাও। দাওয়াতের কাজ আবার ব্যাপকভাবে চালু করো। সবাইকে এর বুঝ দাও। দাওয়াতের মেহনতকে আবার যিন্দা করো। আমি জানি না—এ কাজ আবার কিভাবে শুরু হবে'। তাঁর এ অস্থিরতা ও পেরেশানি যত দিন যায় ততো বাড়ে। শুধু বাড়তে থাকে। সাথে তাঁর রোনাজারি, আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি ও আহাজারি।

এবার দাওয়াত আসে বায়তুল্লাহর যিয়ারতের। তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেন হজ্বের সফরের। ওখানে পৌঁছে মাশাইরে হজ্ব তথা মুযদালিফা, মিনা, আরফা ও মক্কা-

মদিনার পবিত্র স্থানসমূহে নেহায়ত অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাধারণ মুসলমানদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর রাস্তা খুলে দাও। তুমি আমাকে দ্বীনের দাওয়াতের পথ ও পদ্ধতির প্রতি রাহনুমায়ি করো। পথ দেখাও। এ বিষয়ে আমার অন্তরকে খুলে দাও। আমি না-চীজ। আমি অধম। আর তুমি তাওফিক দানকারী। তুমি তাওফিক না দিলে আমি কী করতে পারি? আমার কোনো যোগ্যতা নেই। আমি দুর্বল। আমি তোমার দরবারে ভিক্ষা চাই। তুমি উম্মতের হেদায়তের ব্যবস্থা করো'।

আল্লাহপাক তাঁর দুআ কবুল করেন। তাঁর আরজি শুনেন। তাঁর সীনা খুলে দেন। দাওয়াতের কাজের জন্য তাঁর আহাজারি, রোনাজারির ফলে এ কাজের একটি রূপরেখা তাঁর কলবে আসে। উসূল ও আদাব তাঁর যেহনে হাযির হয়।

হজ্ব শেষে তিনি হিন্দুস্তান ফিরে আসেন। হিন্দুস্তানে ফিরে এসেই রাজধানী দিল্লীর বাইরে নেযামুদ্দিন বস্তি থেকে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।

তাঁর অবস্থা ছিল এই, তিনি শহরের মার্কেটসমূহ, গ্রাম ও বস্তিতে গিয়ে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন, মসজিদ ও তালীমের হালকায় জোড়ার তারগীব ও উৎসাহ প্রদান করতেন; যাতে তারা এর মাধ্যমে নামায ও ইসলামের বুনিয়াদি মাসাইল শিখতে পারে। ওই বুনিয়াদি মাসাইল, ইসলামি আদাব, আখলাক ও শিষ্ঠাচার ভালোভাবে জানা ও এর উপর আমল করার কথা বলতেন। আর এসব বিষয় অন্যকে জানানোর জন্য তিনি মানুষকে বলতেন, 'নিজের খরচে মাসে তিন দিন; বৎসরে চল্লিশ দিন আর জীবনে চার মাসের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হও'।

আল্লাহ তাআলা তাঁর মুখলিস ও নিষ্ঠাবান এ বান্দার মেহনতে বরকত দেন। ফলে তাঁর আশেপাশে পাক-সীরত ঈমানওয়ালা এমন একদল লোক জমা হয়ে যায়, যাঁদের সম্পর্ক সমাজের সকল তবকা ও শ্রেণীর সাথে ছিল। এঁদের মধ্যে আলিম-উলামা, ব্যবসায়ী, কৃষক, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিজীবী এবং ছাত্র-শিক্ষক সবাই ছিল।

হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. এ জামাতের জন্য কয়েকটি নিয়মনীতি ঠিক করেন। যার কয়েকটি আমি এখানে উল্লেখ করয়ী—

১. নিজ খরচে বের হওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তিই আল্লাহর রাস্তায় বের হবে সে নিজের পকেটের টাকা খরচ করবে। কোনো সংগঠনের পক্ষ থেকে অথবা চাঁদা তোলে খরচ করা যাবে না। অতএব যদি কারো সময় বা সামর্থ্য না থাকে তাহলে সে নিজের মহল্লায় মাকামি কাজে জোড়ে থাকবে।

২. প্রচলিত রাজনৈতিক কাজে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকবে।

৩. ইজতেহাদি ও শাখাগত এবং ফেকহি মাসাইলের আলোচনা করা যাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে যার মাযহাব অনুযায়ী চলবে। যেদেশে যে মাযহাব চলে এর উপর

আমল করতে থাকবে। পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ যেন ঈমান, ইয়াকিন, ইখলাস, নামায, ইলম, যিকির ও ইকরামুল মুসলিমিনের প্রতি থাকে। মুসলমানের হক ও অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখবে। দাওয়াতের কাজে ও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াতে লেগে থাকবে। এটাকেই নিজের কাজ বানিয়ে নেবে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর এ প্রিয় বান্দার ওই কাজে বরকত দেন ও তা এমনভাবে কবুল করেন যে, যা একটি বস্তি ও গ্রাম থেকে শুরু হয়েছিল তা তরক্কি ও উন্নতি করতে করতে আজ আন্তর্জাতিক এক দাওয়াতি মিশনে পরিণত হয়েছে। সকল দেশ ও সকল অঞ্চলের মানুষ আজ এ কাজকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

ড. মাওলানা আবদুর রাযযাক ইসকন্দর
করাচি, পকিস্তান

২০-২৭

তাবলীগ জামাতের

হযরতজিদের জীবনী

তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা

হযরতজি ইলয়াস কান্দালবি রাহ.এর জীবনী

জন্ম ও বংশ পরিচয়

১৩০৩ হিজরিতে তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের মুযাফফরনগর জেলার কান্দালার এক ইলমি খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। এটি ছিল কান্দালা ও ঝানঝানার সিদ্দিকি শায়খদের একটি প্রসিদ্ধ ও জ্ঞানী-গুনী বংশ। উপমহাদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণে এই খান্দান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর ঐতিহাসিক নাম ছিল মুহাম্মদ আখতার ইলয়াস। পিতার নাম মাওলানা ইসমাঈল রাহ.। তিনি একজন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। ইবাদাতের পাশাপাশি আর্তমানবতার সেবায় প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি নেযামুদ্দিনে অবস্থান করতেন। তাঁর মাতার নাম শাফিয়া বিবি। শায়খ ইলয়াস রাহ. ছিলেন মাওলানা ইয়াহইয়া রাহ. এর ছোট ভাই। কান্দালায় নানার বাড়িতে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহতি হয়। নানি উম্মিবির সঙ্গে হযরতের খুব মহব্বত ছিল। তিনি প্রায় বলতেন, আখতার আমি তোমা থেকে সাহাবায়ে কেরামের ঘ্রাণ পাচ্ছি। হযরত শায়খুল হিন্দ রাহ. বলতেন, আমি যখন মাওলানা ইলয়াসকে দেখি তখন আমার সাহাবায়ে কেরামের কথা মনে হয়।

শিক্ষাদীক্ষা

নিজ গ্রাম কান্দালাতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। হযরতের মেঝো ভাই মাওলানা ইয়াহইয়া রাহ. গাঙ্গুতে অবস্থানের কারণে পরিবারে শিক্ষা-দীক্ষার খুব একটা ভালো ব্যবস্থাপনা ছিল না। ফলে মাওলানা ইয়াহইয়া রাহ. ১৩১৪ হিজরিতে তাকে গাঙ্গুহে নিয়ে পাঠদান শুরু করেন। তখন গাঙ্গুহ ছিল উলামায়ে কেরামের কেন্দ্রস্থল। কিছুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই ইলয়াস রাহ. অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর শিক্ষার গতি থেমে যায়। একটানা সাত বছর চিকিৎসা চলার পরও কোনো ফল হয়নি। অবশেষে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রাহ. এর পুত্র হাকিম মাসউদ আহমদ তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। আল্লাহর ফযলে তার চিকিৎসার বদৌলতে হযরত সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করেন। ১৩২৩ হিজরিতে হযরত গাঙ্গুহি রাহ. ইন্তেকাল করলে তিনি মর্মাহত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি চলে আসেন দারুল উলুম দেওবন্দে। সেখানে তিনি শায়খুল হিন্দ রাহ. এর নিকট দাওরায়ে হাদীস সমাপন করেন। পরে আপন ভাই মাওলানা ইয়াহইয়ার রাহ. এর কাছে পুনরায় দাওয়ারা হাদীসের কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন।

শিক্ষাদান

গাঙ্গুহে অবস্থানকালে তিনি দারস দানের কাজ শুরু করেন। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রাহ. প্রাথমিক জীবনে তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৩২৮

হিজরিতে মাযাহিরুল উলুম মাদরাসার কঠিন কিতাব পড়ানোর দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হলে তিনি শিক্ষাদানে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এরপর ১৩৩৮ হিজরিতে তিনি চলে আসেন নেযামুদ্দিনের বাংলাওয়ালি মসজিদে। এখানে একটি মাদরাসা ছিল। এতদুভয়ে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিতেন তাঁর বড় ভাই মাওলানা রাহমাতুল্লাহ। বড় ভাইয়ের ইন্তেকালের পর তিনি এখানে এসে নিষ্ঠার সাথে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন।

আধ্যাত্মিকতা

হযরতের আধ্যাত্মিকতা বা আত্মশুদ্ধি শৈশবকাল থেকেই প্রকাশ পায়। তাঁর সহপাঠী মাওলানা রিয়াযুল ইসলাম বলেন, যখন আমরা মক্তবে পড়ি তখন একদিন ইলয়াস একটি কাঠ নিয়ে এসে আমাকে বলে, চলো মিয়া রিয়াযুল, আমরা বে-নামাযিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করি। হযরতজি ইলয়াস রাহ. বলেন, একবার আমি আমার মেঝো ভাই ইয়াহইয়া রাহ.কে বললাম, যদি হযরত গাঙ্গুহি রাহ. আমাকে অনুমতি প্রদান করেন তবে আমি তাঁর পার্শ্বে বসে অধ্যয়ন করতাম। হযরতের এই আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরে গাঙ্গুহি রাহ. বললেন, অসুবিধা নেই। ইলয়াসের কারণে আমার কাজে কোনো ব্যাঘাত হবে না। এহেন আন্তরিক সম্পর্কের কারণে হযরত গাঙ্গুহি রাহ. যদিও ছাত্রদেরকে বায়আত করতেন না, তবুও মাওলানা ইলয়াস রাহ. কে ছাত্রাবস্থায়ই বায়আত করেছিলেন। হযরত গাঙ্গুহির রাহ. ইন্তেকালের পর তিনি মাওলানা খলিল আহমদ সাহরানপুরি রাহ. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর অন্তরে লুকায়িত ছিল জিহাদের বীজ। তাই তিনি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রাহ. এর কাছে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেন। এভাবেই ইলয়াস রাহ. আধ্যাত্মিকতার উচ্চশিখরে আরোহণ করে মাওলানা খলিল আহমদ সাহরানপুরির রাহ. পক্ষ থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হন।

তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম

নুবুওয়াতের ধারা শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং রাসূল সা. আনীত দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহপাক যুগে যুগে এমন মনীষী সৃষ্টি করেন; যাঁরা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঞ্জাম দিবেন। উম্মতের কাছে দ্বীন পৌছানো ও তাদের আত্মশুদ্ধির প্রতি আগ্রহ হযরতের জন্মগত ও বংশগত বৈশিষ্ট্য। একদা আল্লামা ইলয়াস কান্দালবি রাহ. এই ধারণা নিয়ে বের হলেন যে, যদি কোনো মুসলমান আসা-যাওয়া করতে দেখেন তাহলে তাকে নিয়ে মসজিদে নামায আদায় করাবেন। হঠাৎ কতিপয় মুসলমান দেখে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলল, আমরা কাজে যাচ্ছি। তিনি প্রশ্ন করলেন, মজুরি কত মিলবে? তারা উত্তর দিল, এত টাকা। তিনি বললেন, যদি এ পরিমাণ মজুরি এখানে মিলে যায়, তাহলে কি আর যাওয়ার প্রয়োজন? তারা এ প্রস্তাব মেনে নিল। তখন তিনি তাদেরকে মসজিদে নিয়ে কুরআন পাক ও নামায শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং তাদের প্রত্যেককে মজুরি প্রদান

করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তারা সবাই নামাযে অভ্যস্ত হয়ে গেল। মেওয়াতিদের দ্বীনহীনতা দেখে হযরত অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। তিনি তিলে তিলে তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেন। প্রথমেই মাওলানা ইলয়াস রাহ. মেওয়াতিদের বদদ্বীনি ও মূর্খতা দূর করার পদক্ষেপ নেন। সে লক্ষ্যেই তিনি সেখানে বহু মক্তব চালু করেন। তখন মেওয়াতে মক্তব চালু করার চেয়ে কঠিন আর কোনো পদক্ষেপ ছিল না। এমন কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল যেমন বাঘকে জঙ্গল থেকে বের করা। কিন্তু ইলয়াস রাহ. সাহস ও হিম্মতের পাহাড় ছিলেন। তিনি কখনো ভীত হতেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের কাছে পড়ার জন্য শুধু শিশুদের চাই। শিক্ষকদের বেতনের ব্যবস্থা আমি করব।

মোটকথা অনেক কষ্ট সাধনার মাধ্যমে তিনি মেওয়াতে শত শত মক্তব চালু করেন। এতে আশাতীত সফলতা অর্জিত হয় নি। কেননা তাঁর বাসনা ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে একটি বিপ্লবী পরিবর্তন সৃষ্টি করা। এরপর মাওলানা ইলয়াস রাহ. বেতনভূক্ত মুবাল্লিগ নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে মেওয়াতে দ্বীন প্রচারের আদেশ দিলেন। উক্ত পন্থায়ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হল না। তখন তিনি চিন্তা করলেন এমন একটি পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যেটা চালু ছিল প্রথম যুগে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে। তা ছিল অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবক ও মুজাহিদ সৃষ্টি। ফলে তিনি মেওয়াতিদের মধ্যে একদিকে তলবে দ্বীনের উৎসাহ প্রদান এবং অপরদিকে তলবে দ্বীনের জন্য ঘর-বাড়ি ত্যাগ করার শিক্ষা দেন। অবশেষে তিনি কয়েকজন মেওয়াতিকে জামাতবন্দি করে তাবলীগের কাজে পশ্চিম বাংলায় প্রেরণ করেন। আনুমানিক ১৩৫২ হিজরিতে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় তিনি লোকদেরকে জামাতবন্দি করে পাঠাতে থাকেন। মেওয়াতবাসীদের মধ্যে যে পরিবর্তন ও সংশোধণ আনা কয়েক বছরে সম্ভব ছিল না, তা জামাতবন্দি হয়ে দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে খুব কম সময়ে সম্ভব হয়েছে। উলামা-মাশায়েখ ও সর্বসাধারণ উক্ত কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়ায় তা খুব দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। মেওয়াত এলাকার 'কুজায়ে নূহ' ও 'গৌঢ়গানু'সহ অন্যান্য স্থানে লোকদের বিরাট সমাবেশ ঘটে। জামাত চতুর্দিকে বের হতে থাকে। মেওয়াতে হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর প্রচেষ্টায় অসংখ্য পাক্কা মুসলমান ও খাঁটি ঈমানদার তৈরি হয়। যাঁদের ললাট থেকে ঈমানি নূরের জ্যোতি বের হচ্ছিল। মেওয়াতের প্রকৃত অবস্থা শায়খ আবুল হাসান আলী নদবি রাহ. 'মাওলানা ইলয়াস ও তাঁর দ্বীনি দাওয়াত' গ্রন্থে এভাবে লিখেন-'প্রায় সমগ্র মেওয়াতবাসী মুসলমান হলেও তা ছিল শুধু নামেমাত্র। হিন্দুদের উপাস্য দেবতাই মেওয়াতিদের পূজ্য দেবতা ছিল। মহররম, ঈদ ও শবে বরাতের চেয়ে হোলি খেলার গুরুত্ব মেওয়াতিদের কাছে কোনো অংশেই কম ছিল না। জন্মাষ্টমী, দেওয়ালি ইত্যাদি বেশকিছু হিন্দু পর্ব তারা পালন করত। বিয়ে-শাদির শুভদিন নির্ধারণের জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকা হত। 'রাম' ছাড়া সব হিন্দু নামই তারা গ্রহণ করত। নামের শেষে শিং এর বহুল ব্যবহার দেখা যেত।

অন্য জায়গায় তিনি লিখেন, আচার অভ্যাসে তারা ছিল অর্ধ হিন্দু। তাদের গ্রাম-বস্তি গুলোতে মসজিদ খুবই কম ছিল। এত বড় এলাকাতে মাত্র আটটি মসজিদ ছিল। বিশেষত আনন্দদায়ক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলোতে তাদের নীতি অনেকটা দু'ধর্মের আপোষমূলক মনে হত। এই ছিল মেওয়াতিদের অবস্থা, যাদের প্রতি তিনি ও তার গোত্র সদয় দৃষ্টি দিয়েছিলেন। হযরতের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে মেওয়াতবাসী সোনায়-সোহাগায় পরিণত হল। তিনি উক্ত কাজ আরবেও শুরু করবেন। সুতরাং ১৩৫৬ হিজরিতে এই বাসনা নিয়ে হজ্বে গমন করেন। এই কাজের জন্য তিনি তৎকালীন আরব রাষ্ট্রপ্রধানগণের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। মোটকথা উক্ত সফরেই তিনি আরবে এ কাজের ভিত্তি স্থাপন করে আসেন। বিশ্বব্যাপী চলমান তাবলীগ জামাত ইলয়াস রাহ. প্রবর্তন করেন।

বৈবাহিক বন্ধন

হযরতজি ইলয়াস কান্ধালবি রাহ. প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ মাওলানা রউফুল হাসান সাহেবের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহ অনুষ্ঠানে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি ও খলিল আহমদ সাহরানপুরি রাহ. এর মতো জগৎবিখ্যাত আলেমে দ্বীন ও বুযুর্গগণ উপস্থিত ছিলেন। ইলয়াস রাহ. এর একজন মেয়ের বিয়ে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. এর সাথে হয়। ইলয়াস রাহ. এর ছেলে মাওলানা ইউসুফ রাহ. পিতার মৃত্যুতে এ দাওয়াতি কাজের যিম্মাদার নিযুক্ত হন।

মাওলার সান্নিধ্যে

২১ রজব ১৩৬৩ হিজির মোতাবিক ১৩ জুলাই ১৯৪৪ ইংরেজি রোজ বৃহস্পতিবার ফজরের আযানের সময় আপন মাওলার সান্নিধ্যে যাত্রা করেন। আল্লাহ্পাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করুন। আমীন।

তাবলীগ জামাতের দ্বিতীয় আমীর

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ রাহ. এর জীবনী

জন্ম

শায়খ ইউসুফ বিন ইলয়াস বিন ইসমাঈল ১৩৩৫হিজরি মোতাবিক ১৯১৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তখনও তাঁর পিতা জামেয়া মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের পরিবারের পুরুষ ও মহিলাগণ ছিলেন মুত্তাকি ও পরহেযগার। তিনি ওই দ্বীনি ও ইলমি পরিবেশে লালিত পালিত হন। তাঁদের পরিবারের মহিলাদের অনেকে ছিলেন কুরআনে হাফিযা।

প্রাথমিক শিক্ষা

তিনি দশ বৎসর বয়সে কুরআন শরীফ হিফয করেন। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে নিয়ে হাদীস পর্যন্ত আপন পিতা শায়খ ইলয়াস রাহ. এর কাছে গ্রহণ করেন। এরপর দ্বিতীয়বার মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরে ভর্তি হয়ে ওখানকার বড় বড় শিক্ষকদের কাছে হাদীস পড়েন। এঁদের অন্যতম হচ্ছেন- শায়খ মনযুর আহমদ খান, শায়খ আবদুর রহমান ও চাচাত ভাই শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ.। অবশেষে ১৩৫৪ হিজরিতে ওখান থেকে ফারিগ হন।

ইলমের আগ্রহ

শায়খ ইউসুফ রাহ. ইলমের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি বেশিরভাগ সময় কিতাব অধ্যয়নে কাটাতেন। লেখালেখিরে প্রতি ছিল তাঁর বেশ মনোযোগ; তাইতো দেখা যায় তিনি شرح معاني الآثار এর মতো হাদীসের কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন; যার নাম اماني الاحبار। এ কিতাবটি তার হাদীস, রিজাল ও ফেকাহ শাস্ত্রে গভীরতার পরিচায়ক। তার লিখিত দ্বিতীয় গ্রন্থ হচ্ছে حياة الصحابة ; যা সীরাত ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনী শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে জড়িতদের জন্য এমন একটি কিতাবের প্রয়োজন ছিল; যাতে থাকবে দ্বীনের জন্য কোরবানির আলোচনা, দাওয়াতের কাজে নিজেকে সপে দেয়ার ঘটনা, দ্বীনের মেহনতের লক্ষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার পর্যালোচনা। আর এসব বিষয় পূর্ববর্তীদের আলোচনা ব্যতীত কি করে পাওয়া যাবে। আবার সাহাবায়ে কেরাম থেকে উত্তম আর কে হতে পারে? দ্বীনের তরে তাঁদের চেয়ে আর কার বেশি কোরবানি থাকতে পারে?

দওয়াতের কাজে

হযরতজি ইলয়াস রাহ. দাওয়াতের কাজে ডুবে ছিলেন, যা কাছ থেকে দেখছিলেন ছেলে ইউসুফ। তিনি দেখেন কেমন করে পিতা এ কাজে নিজেকে সপে দিচ্ছেন। ধীরে ধীরে তা তাঁর মনে দাগ কাটতে থাকে। অবশেষে পিতা তাঁকে নিজের

জীবদ্দশায়ই এ কাজে বের হতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বিভিন্ন জামাতের সাথে সময় লাগাতে থাকেন। ফলে এর গুরুত্ব তাঁর বুঝে আসতে থাকে যে, মানুষকে দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার এটাই সবচেয়ে কার্যকরি মাধ্যম। কলম যে কদমের কাজ দেয়না বিষয়টি তখন তিনি বুঝতে সক্ষম হন। দ্বীনের কাজের জন্য প্রয়োজন আত্মশুদ্ধির, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের, আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট সহ্যের, নিজের জান মাল খরচের।

অবশেষে শায়খ ইলয়াস রাহ. মৃত্যুবরণ করলে দাওয়াতের যিম্মাদারি তাঁর উপরই বর্তায়। তখন থেকে দাওয়াতের কাজে নতুন মাত্রা যোগ হয়। দাওয়াতের কাজে নিজেকে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রাখেন। ভারতের ভিতরে বাইরে ইজতেমা করতে থাকেন। জামাতসমূহের রুখ দিতে থাকেন বহির্বিশ্বে। নিজেও সফর করতে থাকেন দেশে দেশে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা । বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে। ফলে তাঁর সময়কালে বিশ্বের আনাচে কানাচে দাওয়াতের কাজ ছড়িয়ে পড়ে।

দাওয়াতের প্রসারে তাঁর চিন্তাধারা

তিনি মনে করতেন আরবরাই হল এমহান দাওয়াতের কাজের মূল আহল। কারণ আল্লাহপাক দাওয়াতের জন্য তাঁদেরকেই প্রথমে কবুল করেন। তাঁদের শিরা উপশিরায় রয়েছে সাহাবায়ে কেরামের রক্ত। তাই তিনি আরবদের মাঝে দাওয়াতের কাজ ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন; কারণ আরবরা এ কাজ গ্রহণ করে নিলে সারা বিশ্বে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। কারণ হজ্ব উপলক্ষে সারা বিশ্বের লোকেরা প্রতি বৎসর ওখানে জমা হয়। এলক্ষে তিনি নিজে বারবার হেজায ভূমিতে সফর করতে থাকেন। সাথে সাথে হজ্বের কাফেলাসমূহে দাওয়তের কাজ জোরে শোরে চালু করেন। ফলে তাঁর সময়কালেই দাওয়াতের কাজ আরব বিশ্বসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সুদীর্ঘ বিশ বৎসর পর্যন্ত দাওয়াতের যিম্মাদার ছিলেন। তিনি জীবনে তিনটি হজ্ব ও দুইটি উমরা পালন করেন।

আখিরাতের পথে

১৯৬৫ ইংরেজির ১লা ফেব্রুয়ারি তিনি দুই মাসের তাবলীগি সফরে বের হন। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বয়ান দিতে থাকেন। অবশেষে দেশে ফেরার একদিন পূর্বে লাহোর শহরে বয়ান দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সারা রাত সেবা যত্ন চলে। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার হাসপাতালে নেয়ার পথে কালেমা পড়তে পড়তে প্রভূর সাথে মিলিত হন। লাহোরে জানাযা হয়। এরপর দিল্লীতে লাশ এনে নেযামুদ্দিনে দাফন করা হয়।

তাবলীগ জামাতের তৃতীয় আমীর
হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান রাহ. এর জীবনী

জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা

শায়খ এনামুল হাসান বিন একরামুল হাসান রাহ. জুমাদাল উলা ১৩৩০ হিজরি মোতাবিক ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতের কান্দালা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এগার বৎসর বয়সে কুরআন শরীফ হিফয করা ছাড়াও উর্দু, ফার্সিসহ দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়াদি শিক্ষা করে নেন। এরপর ১৩৪৯ হিজরিতে কান্দালা থেকে সফর করে শায়খ ইলয়াস রাহ. এর কাছে চলে যান। ওখানে মিযান, শরহে জামি, কুতবি ইত্যাদি পড়েন। এরপর দুই বছর মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরে হযরতজি ইউসুফের সাথে লেখা পড়া করেন। তারপর নেযামুদ্দিনে মুতাওয়াল, হামাসা ও হেদায়া পড়ে ১৩৫৪ হিজরিতে সাহারানপুর এসে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. এর কাছে সিহাহ সিত্তা ও মুআত্তাইন পড়েন। এরপর শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. এর মেয়েকে বিবাহ করেন।

দাওয়াতি সফর

তিনি সর্বপ্রথম ইলয়াস রাহ. এর সাথে হেজায সফর করেন। ওখান থেকে ফিরে এসে তাঁরই সাথে মেওয়াত যান।

১৩৬৩ হিজরিতে সর্বপ্রথম মেওয়াতে ইজতেমা হয়।এরপর তিনি অসুস্থতার কারণে তিন বছর কান্দালায় অবস্থান করেন।

১৩৬৯ হিজরি থেকে তিনি স্থায়ীভাবে নেযামুদ্দিনে অবস্থান করতে থাকেন। দাওয়াতি কাজে ইজতেমায় শরীক হওয়ার জন্য তিনি অগণিত সফর করেন। তন্মধ্যে কলিকাতা, পেশাওর, নেপাল, মুরাদাবাদ, মেওয়াত, করাচি, মুলতান, ভাওয়ালপুর, রায়বেণ্ড, রওয়ালপিণ্ডি, ফয়সালাবাদ, ঢাকা, চিটাগাং ইত্যাদি।

১৩৮৪ হিজরিতে আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে নিয়ে আমৃত্যু বিভিন্ন ইজতেমায় শরীক হতে থাকেন।

১৩৯২ হিজরিতে তিনি ইউরোপ ও আরব বিশ্বের উদ্দেশ্যে লম্বা সফর আরম্ভ করেন। তখন তিনি কুয়েত, ইরাক, মরোক্ক, লেবানন, লিবিয়া, কর্ডোবা, জেব্রালটা, তুরস্ক, ফ্রান্স, সিরিয়া ও হারামাইন সফর করেন।

১৩৯৫ হিজরিতে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে সফর করে মোজাম্বিক, জাম্বিয়া,কেনিয়া যান।

১৩৯৭ হিজরিতে মিশকাত শরীফের আটটি অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেন। যার নাম দেন الأبواب المنتخبة من المشكاة

১৩৯৮ হিজরিতে পাকিস্তান, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হারামাইনের সফর করেন।

১৪০০ হিজরিতে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, কানাডা ও পাকিস্তান সফর করেন।

১৪০২ হিজরিতে আবার ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, উমান ও হারামাইন সফর করেন।

১৪১৬ হিজরি পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে সফর করতে থাকেন।

১৪১৬ হিজরিতে নেযামুদ্দিন মেওয়াতবাসীদের একটি ইজতেমা ছিল।এটাই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ ইজতেমা

হযরতজি ইউসুফ রাহ. তাঁকে খুবই গুরুত্ব দিতেন ও সম্মান করতেন। তিনি বলতেন, এনাম সাহেব তো এ কাজ হযরে সফরে আব্বাজানের সাথে থেকে শিখেছেন; তাই তাঁর মধ্যে রয়েছে আব্বাজানের মেযাজ ও প্রকৃতি। এ কারণেই দেখা যায় হযরতজি ইউসুফ রাহ. গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁর মতামতের ভিত্তিতেই নিতেন।

তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। তাঁর কাছে না চাইলে তিনি কোনো কথা বলতেন না। আর বললেও খুবই কম তবে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন। তিনি তো কথা বলা ও বয়ানের ভার দিয়ে রেখেছিলেন শায়খ উমর পালনপুরিকে।তিনিই তাঁর পক্ষ থেকে বয়ান দিতেন। তিনি ছিলেন ইখলাসের পাহাড়। সবকিছু তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করতেন।

মাওলার মোলাকাতে

এরপর তিনি আপন মাতৃভূমি কান্দালায় যান। ওখান থেকে ফিরে নেযামুদ্দিনে আসেন। তিনিও আপন বন্ধু ইউসুফ সাহেবের ন্যায় হাসপাতাল যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৪১৬ হিজরির আশুরা মাসে আপন মাওলার সান্নিধ্যে গমন করেন। তখন ছিল ১৯৯৫ সালের জুন মাস।

আল্লাহপাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমীন।

৩০ - ৪৫

বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের চোখে

তাবলীগ জামাত

কেউ যদি দেখতে চায় যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কেমন মানুষ ছিলেন, সে যেন তাবলীগওয়ালাদেরকে দেখে নেয়।............. **শায়খ থানবি রাহ.**

তাবলীগ জামাত একটি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আন্জাম দিয়ে যাচ্ছে; তাই এঁদের উৎসাহিত করার প্রয়োজন রয়েছে।.............**শায়খ মাদানি রাহ.**

মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইসলামের মূর্তপ্রতীক হয়ে ইসলামের আমলি নমুনা পেশ করে যাচ্ছে তাবলীগ জামাত।................ **শায়খ ইউসুফ বিননুরি রাহ.**

হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাতের এই কর্মধারা ইতোপূর্বে আমার দেখার ও বুঝার সুযোগ হয়েছে। এ ধারায় এ কাজে রূহ পরিলক্ষিত হয়।.............. **ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. জাকির হোসাইন রাহ.**

নিঃসন্দেহে এ মুহূর্তে এ ধরনের পবিত্র ইজতেমা বিশ্বের মুসলমানদের খুবই প্রয়োজন।............ **শায়খ বিন বায রাহ.**

'এঁরা আসমানী মাখলুক, যাঁরা জমিনে চলে'।............. **শায়খ যিন্দানি**

মন্ত্রী থাকাকালে আমি যখন বেলুচিস্তান থেকে করাচি আসতাম, তখন বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে আমি তাবলীগি মারকাযে বয়ান করেছি, রাতে স্বপ্নে নবীজি সা. এর দর্শন নসীব হয়েছে। এভাবেই আমি তাবলীগ জামাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।............ **শামসুল হক আফগানি রাহ.**

বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের চোখে

তাবলীগ জামাত

হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনত শুরু করেছেন ১৯২৩ সালে। প্রথম থেকেই উলামায়ে কেরাম এই জামাতের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন, যার ফলে জামাতের লোকদের মেহনত ও কোরবানি সুফল দান করছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ দাওয়াতের কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে নিজের জীবন বদল করছে। দাওয়াতের সাথীরা দেশে ও বিদেশে তাবলীগি সফরে বের হচ্ছেন।

উলামায়ে কেরামের নিকট এই তাবলীগ জামাতের মূল্যায়ন কী? উপমহাদেশের শীর্ষ আলেমগণের মতে তাবলীগ জামাতের এই মেহনত কেমন? এখানে তাঁদের কিছু মতামত তুলে ধরা হলো।

হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি রাহ.

কেউ যদি দেখতে চায় যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কেমন মানুষ ছিলেন, সে যেন তাবলীগওয়ালাদেরকে দেখে নেয়। আল্লাহ যাঁর দ্বারা খুশি কাজ নিয়ে থাকেন। এই কাজ মাওলানা ইলয়াসের ভাগে পড়েছে। তিনি হতাশাকে আশায় পরিণত করেছেন। এই কাজ দ্বারা উম্মতের অবশ্যই উপকার হবে। আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন এবং সব ধরনের ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করুন।

শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানি রাহ.

মুহতারাম,এই তাবলীগ জামাত শুধু যে একটি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আন্‌জাম দিয়ে যাচ্ছে তা নয়; বরং এঁদের উৎসাহিত করার প্রয়োজন রয়েছে। আর তাঁদের নিজেদেরও মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার, মুসলমানদের পরস্পরের একতাবোধ জন্মানোর এবং তাদের ধর্মীয় চেতনাবোধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বড়ই প্রয়োজন । তবেই ভবিষ্যতে অভূতপূর্ব ফলাফলের আশা করা যায়। সুতরাং আশা করি ভবিষ্যতে পূর্ণ সামর্থ ব্যয় করে এঁদের উৎসাহিত করবেন।

শায়খুত তাফসীর মাওলানা আহমদ আলী লাহোরি রাহ.

শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ লাহোরি রাহ. তৎকালীন তাবলীগ জামাতের আমীর মাওলানা ইউসুফ রাহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাতকালে বলেন, 'আমি

আপনার জন্য দুআ করয়ী। আল্লাহ মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর এই তাবলীগি বাগানকে সজীব ও সতেজ রাখুন এবং আজীবনের জন্য কবুল করুন।

তিনি আরেক মজলিসে বলেন,' যে লোকগুলোর অহমিকা এ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল যে, নিজের ঘটি থেকে পানি নেওয়া পর্যন্ত অমর্যাদা মনে করত, এই জামাতের বরকতে তারা কাঁধে গাট্টি বহন করে মহল্লায়-মহল্লাহয় ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

মাওলানা সাইয়্যিদ সুলায়মান নদবি রাহ.

হেকমতের সঙ্গে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ে বাধা দানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অমুসলিমদেরকে মুসলমান বানানোর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নামের মুসলমানদেরকে কামের মুসলমান এবং বংশগত মুসলমানকে দ্বীনি মুসলমান বানানো।

বর্তমান যুগে তাবলীগ জামাতই এর আমলি নমুনা উপস্থাপন করেছে।

মাওলানা শামসুল হক আফগানি রাহ.

মন্ত্রী থাকাকালে আমি যখন বেলুচিস্তান থেকে করাচি আসতাম, তখন বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে আমি তাবলীগি মারকাযে বয়ান করেছি, রাতে স্বপ্নে নবীজি সা. এর দর্শন নসীব হয়েছে। এভাবেই আমি তাবলীগ জামাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

মাওলানা সাইয়্যিদ ইউসুফ বিননুরি রাহ.

বোধহয় পৃথিবীর এমন কোনো ভূখণ্ড নেই, যেখানে মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর জামাতের পা পড়েনি।

সমগ্র পৃথিবীর কোণায়-কোণায় দাওয়াত পৌছে যাওয়া নবীগণের দাওয়াত পদ্ধতির সাদৃশ্য প্রমাণ করে। এই অপেক্ষা নেই যে, মানুষ আসবে এবং দ্বীন শিখবে; বরং অলিতে-গলিতে ও ঘরে-ঘরে দাওয়াত পৌছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুখের কথা, চরিত্র ও নিজেদের কর্মপদ্ধতি দ্বারা দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইসলামের মূর্তপ্রতীক হয়ে ইসলামের আমলি নমুনা পেশ করা হচ্ছে, যার সুনিশ্চিত ফল দেখা যাচ্ছে।

হাকীমুল ইসলাম মাওলানা কারি তায়্যিব রাহ.

ইসলাহে নফসের জন্য চারটি পদ্ধতি জরুরি। ঘটনাক্রমে তাবলীগ জামাতের মধ্যে চারটিই বিদ্যমান।

১. সৎ মানুষের সাহচর্য।
২. যিকির ও ফিকির।
৩. আত্মপর্যালোচনা।
৪. আল্লাহর সূত্রে ভ্রাতৃত্ব।

এই চার গুণের সমষ্টির নাম তাবলীগ জামাত। সাধারণ মানুষের জন্য আত্মার সংশোধনের এর চেয়ে উন্নত কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। এই পদ্ধতিতে দ্বীন

ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং দেশে-দেশে ইসলামের আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস ও আমল ঠিক হচ্ছে। মানুষ দ্রুতগতিতে নেক আমলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং নিজেদেরকে নবীজি সা.-এর উত্তম আদর্শের আদলে তৈরি করার চেষ্টা করছে।

রাহবরে উম্মাত মাওলানা মুফতী মাহমুদ রাহ.

১৯৭৫ সালের মে মাসে কায়রোতে 'মাজমাউল বুহূছিল ইসলামিয়া'র এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত কনফারেন্সে ভাষণ দিতে গিয়ে মুফতী মাহমুদ রাহ. তাবলীগ জামাত সম্পর্কে বলেন,'এই জামাত আমাদেরকে একটি কর্মপদ্ধতির দিক-নির্দেশনা করছে। তা হলো, 'দাওয়াত ইলাল্লাহ ও তাবলীগে দ্বীন' (আল্লাহর প্রতি আহবান ও দ্বীনের প্রচার) অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং এর ভিত্তি নেক ও মুখলিস লোকদেরকে একত্রিত করা এবং তাঁদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে 'দাওয়াতে ইলাল্লাহ'র জন্য উদ্বুদ্ধ করার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের পুঁজি হলো শুধুই এখলাস। আর তাঁদের মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল হক রাহ.

মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর জামাত মূলত ইসলামের প্রচার-প্রসারের সেই সুন্নত তরীকা, যা রাসুল সা. ও সাহাবায়ে কেরাম প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি হিন্দুস্তানে এমন এক বাতি জ্বালিয়েছেন, যার আলোতে আজ সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, কাল যারা এ-কাজের জন্য অবজ্ঞার হাসি হাসত, আজ সে-ই এ-জামাতের বড় দায়ী হয়ে যাচ্ছে। হাজারো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ বিশাল এক বিপ্লব, যা মাওলানা ইলয়াস রাহ. সাধন করে ফেলেছেন। আল্লাহ পাক মুখলিসদের এই জামাতকে দ্বীনের প্রচার প্রসার ও সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ে বাঁধা দানের সু-মহান দায়িত্ব পালনের তাওফিক দান করুন– আমীন।

ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. জাকির হোসাইন রাহ.

হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাতের এই কর্মধারা ইতোপূর্বে আমার দেখার ও বুঝার সুযোগ হয়েছে। এ ধারায় এ কাজে রূহ পরিলক্ষিত হয়। ঈমান ও ইয়াকিন আলোচনা, পর্যালোচনা ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে অর্জিত হয় না। এ দৌলত যাঁরা লাভ করেন তাঁদের থেকে অন্যদের কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়। তাঁদের অন্তর থেকে অন্যদের অন্তরে প্রজ্বলিত হয়। তাঁদের আমলি জযবা থেকে বে-আমল মৃতদের মাঝে জীবনের সঞ্চার হয়।

তাবলীগ জামাত সম্পর্কে
ড. মাওলানা আবদুর রাযযাক সাহেবের অভিমত

আমি মনে করি তাবলীগ জামাত কোনো দেশে যাওয়া ওই দেশের জনগণ ও হুকুমত উভয়ের জন্য রহমতস্বরূপ। কারণ এ জামাত সাধারণ জনগণ ও শহরের অধিবাসীদের ইসলাহ ও সংশোধনের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে, যাতে ওই দেশের মানুষ ভালো হয়ে আপন খালিক ও সৃষ্টিকর্তার ওয়াফাদার হয়ে যায়। যাঁরা কেবল নিজের দেশ ও জাতির কল্যাণকামী হবে না; বরং সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য ফিকিরমন্দ হবে। মানবতার বন্ধু ও সহযোগী হবে। তাঁরা এমন কাজ করবে না, যা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকারক। তারা চুরি করবে না, কারো মাল ছিনতাই বা লুট করবে না, মিথ্যা বলবে না, কাউকে ধোঁকা দেবে না; বরং সব সময় অন্যের জন্য তাই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে।

এগুলো এমন গুণ যা হুকুমাত ও জনগণ সবার জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। দেখা যায়, হুকুমত সাধারণত ইসলামি হোক বা নাই হোক—নিজের বিপথগামী জনগণের ব্যাপারে অভিযোগ করে থাকে। চোর, ডাকাত, নেশাখোর ও সন্ত্রাসীদের উৎপাতের কথা বলে। এদেরকে অপরাধ থেকে বিরত রাখতে কত আইন ও শাস্তি তৈরি করে। যা দ্বারা বাস্তবে কোনো ফায়দা হয় না।

কিন্তু তাবলীগ জামাত তালীম ও তারবিয়াত তথা শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে এমন যোগ্যতা ও চারিত্রিক শক্তি সৃষ্টি করতে চায়; যা তাঁদেরকে ওইসব অপরাধ থেকে বিরত রাখবে। তাদের অন্তরে অপরাধ সম্পর্কে ঘৃণার জন্ম দেবে। সঙ্গে সঙ্গে এমন গুণাবলি ও চারিত্রিক সৌন্দর্য নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে, যা জনগণ ও হুকুমত উভয়ের জন্য কল্যাণকর এবং উপকারী।

হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم.

'দ্বীন হল কল্যাণকামিতার নাম'। আমরা (সাহাবীগণ) বললাম, কার জন্য হে আল্লাহর রাসুল? রাসুল সা. জবাব দিলেন 'আল্লাহ, তাঁর রাসুল, তাঁর কিতাব, মুসলিম শাসকবর্গ এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য'।

বাস্তব কথা হল, ব্যক্তি সংশোধন হয়ে গেলে এর দ্বারা পূরা সমাজের সংশোধন হয়ে যাবে। দেশে নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবেশ বিরাজ করবে। আত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা ব্যাপক হবে। মানুষ নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। দেখা যায় শাসকগোষ্ঠী সাধারণত দু'টি বিষয়ে ভয় করে—

এক. বাইরের কেউ এসে দেশের রাজনীতিতে নাক গলানো।

দুই. বহিরাগত দ্বারা জনগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি।

তাবলীগ জামাত সম্পর্কে

কয়েকটি প্রশ্ন ও এর জবাব

এ কথা সবার জানা যে, তাবলীগ জামাতে সকল শ্রেণীর মানুষ শরীক হয়ে থাকে। ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী-চাকুরিজীবী, কৃষক-শ্রমিক সকলেই। এদের প্রত্যেকের অবস্থা তো এমন হয় না যে, পূর্ণ ইসলাহ ও সংশোধন হয়ে গেছে। ফলে এদের কারো কারো দ্বারা কখনো কখনো অন্যায় কাজ সংগঠিত হয়ে যেতে পারে। তখনই কেউ কেউ ব্যক্তি বিশেষের এ কাজকে ওই জামাতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে প্রচার চালাতে থাকে। অথচ তা ইনসাফের খেলাফ। ইনসাফ তো হল ব্যক্তি বিশেষের এ ভুলকে তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা, পূরা জামাতের দিকে নয়। কারণ জামাতও তো এই কাজকে ভুল মনে করে থাকে।

একটি ইসলামি দেশ ভ্রমণকালে ওই দেশের এমন একটি অফিস-প্রধানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়; যিনি মাদকসেবন বন্ধ করার দায়িত্বে ছিলেন। ওই ব্যক্তি নিজের দফতরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,'আমাদের কাজ হল, আইন ও শাস্তির দ্বারা যুবকদেরকে মাদক ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা'।

আমি বললাম, এটা খুবই ভালো কথা। দেশে এ ধরনের আইন ও শাস্তি থাকা উচিত। যেগুলোর মাধ্যমে মাদকসহ অন্যান্য অপরাধ থেকে বিরত রাখা যায়। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরকে; কারণ এরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ সম্পদ। তবে এগুলোর পাশাপাশি আরো একটি রাস্তা রয়েছে যদ্দারা যুবকদেরকে মাদক ও নেশাদ্রব্য ব্যবহার ও বিপথগামী হওয়া থেকে আটকানো যায়। দেশকে এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

এর পদ্ধতি হল, ওদেরকে দ্বীনের উপর চলতে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের অন্তরে ঈমানের চেতনা সৃষ্টি করা। যাতে তারা নেককার ও সচ্চরিত্রবান হয়ে যায়। ফলে কোনো আইন ও শাস্তির ভয় ছাড়াই নিজে নিজেই মাদক ও বিপথগামী হওয়া থেকে বিরত থাকবে। ফলে তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে না, কারো ইযযত নষ্ট করবে না, রাষ্ট্র ও জনগণ কারো জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না; বরং নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণ আমানতদারির সাথে আদায় করবে।

আমি তাঁকে আরো বলি, গত রাত আমি আমার সাথীসহ আপনার শহরের তাবলীগ জামাতের মারকাযে হাজির হয়েছিলাম। ওখানে যুবকদের এক বিরাট জামাত ছিল। তাদের বেশিরভাগ ছিল স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র। তাঁদের চেহারায় ছিল নূরের প্রকাশ; সম্মানের উদ্ভাস। কল্পনাও করা যায় না যে, এঁদের দ্বারা মাদকসেবন ইত্যাদি কোনো অপরাধে সংঘটিত হবে।

তখন ওই কর্মকর্তা বলতে লাগলেন, হযরত এ কথা বিলকুল ঠিক। আমিও দেখেছি, যাঁরা এ জামাতের সাথে জোড়ে যায় এঁদের মধ্যে তাকওয়া ও সততার প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে।এঁরা মাদক ইত্যাদি থেকে থাকে দূরে বহু দূরে।

তবে তাবলীগ জামাত সম্পর্কে আমার দু'টি অভিযোগ

১. যখনই কোনো চাকুরিজীবী তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু সময় জামাতের সাথে কাটায়, যেমন এক চিল্লা। তখন দেখা যায় ওই লোকটি চিল্লা লাগানোর পর তাঁদের সাথেই লেগে থাকে। তখন আর সে চাকরির কোনো পরওয়া করে না। আর না বিবি-বাচ্চার ফিকির করে। একদিকে অফিস তাকে খুঁজছে, তো অপরদিকে ঘরওয়ালা তাকে তালাশ করে করে পেরেশান!

২. এ ছাড়া আরো দেখা যায়, স্কুল-কলেজের যেসব ছাত্র বন্ধের ছুটিতে তাবলীগ জামাতের সাথে চিল্লায় বের হয়, তারা বন্ধ শেষ হওয়ার পরও চিল্লা লাগাতে থাকে, ফলে একসময় সে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। তখন আর সে না শিক্ষার প্রতি মনোযোগী থাকে আর না মা-বাপের কথার কোনো পরোয়া করে।

আমি বললাম, হ্যাঁ। এ ধরনের ঘটনা মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও এমন হয়। তবে এটা হলো ব্যক্তিগত দোষ, তাবলীগ জামাতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এ বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলোকে ব্যক্তিবিশেষের কাজ মনে করাই শ্রেয়। যার সাথে তাবলীগ জামাতের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

মূলত, তাবলীগ জামাতের লোকেরা চাকুরিজীবী ও ছাত্রকে কখনো এ কথা বলে না যে, তুমি আপন চাকুরি ছেড়ে দাও, অথবা স্কুল-কলেজের লেখাপড়া বন্ধ করে দাও এবং সার্বক্ষণিক তাবলীগের কাজে লেগে থাকো; বরং তারা বলে থাকে— 'ভাই! অবসর সময় আমাদের সাথে কাটাও, এরপর নিষ্ঠা ও ঈমানদারির সাথে আপন কাজ করতে থাকো'।

এরপর আমি বললাম, আমাদের মাদরাসার মসজিদে প্রতি সপ্তাহে তাবলীগের ইজতেমা হয়। সেখানে ছাত্র ও এলাকার লোকজন অংশগ্রহণ করে থাকে। আর তাবলীগের কোনো মুরব্বি বয়ান করেন। আমি তো আজ পর্যন্ত কারো মুখ থেকে এমন কথা শুনিনি যে, তাঁরা ছাত্রদেরকে বলছে—তোমরা লেখাপড়া ছেড়ে দাও এবং তাবলীগের চিল্লায় চলো; বরং তাঁরা তো ছাত্রদেরকে খুবই মেহনত ও মনোযোগসহকারে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। তবে হ্যাঁ, তাঁরা একথা বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে করাচির তাবলীগি মারকায মাদানি মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তাঁরা বলেন, ১৮-২০ ঘণ্টার জন্য বের হও। কারণ শুক্রবার তো ছুটির দিন। আর বার্ষিক বন্ধের সময় এক চিল্লা লাগাতে চেষ্টা করো।

আসল কথা, সমাজের প্রতিটি বিভাগে কিছু লোক অতি উৎসাহী থাকে। যাদের মাধ্যমে ওইসব ভুল কাজ সংঘটিত হয়। আমার তো মনে হয়, আপনি এমন

চাকুরিজীবী ও ছাত্র পেয়ে থাকবেন যারা অন্য কোনো জযবায় চাকুরি ছেড়েছে বা স্কুল-কলেজ থেকে পলায়ন করেছে।

তাই এ ধরনের কাজের সম্পর্ক ওই ব্যক্তির সাথেই করা সমীচীন। না তাবলীগ জামাতের সাথে। কারণ এটা মোটেই তাবলীগ জামাতের কোনো পলিসি নয়।

আমার আলোচনা শুনে ওই ব্যক্তি পূর্ণ আশ্বস্ত হয়ে বলতে লাগলেন—'বাস্তবেই সাধারণ লোকের সংশোধনের এটাই হচ্ছে সহীহ তরীকা'।

কোনো সময় শরয়ী আহকাম ও ইসলামি আদব জানা না থাকার কারণে অন্তরে সন্দেহ সৃষ্ট হয়।

এরকম একটি ঘটনা হচ্ছে—একদিন জনৈক আরবি যুবকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাবলীগ জামাত সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলে সে বলে ওঠে– 'এ জামাত ভালো ও কল্যাণকর কাজ করে ঠিকই, তবে এঁদের মধ্যে কিছু বিদআত ও খেলাফে সুন্নাত আমল বিদ্যমান। যেগুলোর ব্যাপারে আমার প্রশ্ন রয়েছে।

আমি তাকে বললাম, তুমি নির্দিষ্ট করে আমাকে একটি বিদআতের কথা বলে দাও, আমি তা ওই জামাতের যিম্মাদারদের কাছে পৌঁছে দেব।

তখন সে বলতে লাগল, যখন কোনো জামাত দাওয়াতের জন্য বের হয় তখন তাঁরা বলে, ইনি হলেন আমাদের 'আমীর' অথচ তা বিদআত। আমি বুঝে ফেললাম যে, এ অভিযোগের মূল কারণ হচ্ছে দ্বীনি ইলমের অভাব। তাই আমি ওই যুবককে বললাম, তুমি কোথায় কাজ করো?

সে বলল, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের ধর্মীয় বিষয়ে কাজ করি।

আমি বললাম, তোমার অফিসে কতজন কর্মচারী রয়েছে?

সে বলল, অতজন কর্মচারী কাজ করে। সম্ভবত বিশ বা পঁচিশ বলেছিল।

আমি জানতে চাইলাম– ওই কর্মচারীদের কোনো নেগরান বা সুপারভাইজার কি আছেন?

সে বলল, হ্যাঁ। একজন কর্মকর্তা আছেন। যিনি তাদেরকে দেখাশোনা করেন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন।

আমি বললাম, এটা কি ওয়াকফ মন্ত্রণালয় ও ধর্মীয় বিষয়ে বিদআত নয় যে, উনি হলেন কর্মকর্তা বা 'মুদীর' আর এরা হলেন কর্মচারী?

সে বলল, এটা বিদআত হবে কেন? এটা তো একটি সিষ্টেম। যা এ কথা চায় যে, এদের এমন একজন যিম্মাদর হবেন যিনি তাদের দেখাশোনা করবেন, যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং সঠিকভাবে কাজ চলে।

তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বললাম, ভাই! যদি তুমি তোমার নিজ শহরে আপন অফিসে থাকাবস্থায় যেখানে মাত্র কয়জন কর্মচারী রয়েছে যাদের প্রত্যেকের কাজও নির্ধারিত—এ প্রয়োজন অনুভব করো যে, একজন যিম্মাদার ও নেগরান হলে

কাজ সঠিকভাবে চলবে। তাহলে এখন তুমি নিজে একটু চিন্তা করো যে, যখন একটি জামাত দাওয়াতের জন্য বের হয়, যাতে দশ-পনরজন লোক থাকে, তখন তাঁদের কি শৃঙ্খলা ও নেযামের কোনো প্রয়োজন নেই? তাঁদের মধ্য কি এমন একজন থাকবে না, যে সবার দেখাশোনা ও নেগরানি করবে। যাতে তাঁদের শৃঙ্খলা বজায় থাকে। যে সবার অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখবে। সফরে তো এ প্রয়োজন আরো বেশি। কারণ খানাপিনা, নামায পড়া, সামানের হেফাযত ও দাওয়াতের তারতীব ইত্যাদি কাজের জন্য তো দায়িত্বশীল ব্যক্তি থাকা চাই। তুমি এ দায়িত্বশীল ব্যক্তির নাম 'আমীর' রাখো অথবা 'মুদীর'। নামের পার্থক্যে কিছুই যায়-আসে না ।

এবার যুবকটি মাথা দুলিয়ে বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি তো বিষয়টি বুঝতে ভুল করে ফেলেছিলাম। এর পর আমি তাকে বললাম, 'আমীর' বানানো জায়েয ও মুবাহ নয়; বরং সুন্নাত। তা ছাড়া এটি সফরের অন্যতম আদবও বটে। কারণ নবী করীম সা. আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, 'তোমরা যখন জামাত আকারে সফর করবে তখন একজন 'আমীর' ঠিক করে নেবে'।

কোনো কোনো সাধারণ লোক যারা আলিম নন, তাদের কাছ থেকে তাবলীগি সফরকালে একটি অভিযোগ শোনা যায় যে, তাবলীগ জামাত 'ছয় নম্বর' নির্ধারণ করে দ্বীনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখাকে ছেড়ে দিয়েছে। অথচ দ্বীন তো জীবনের সকল শাখা-প্রশাখাকে অন্তর্ভুক্ত রাখে।

এ অভিযোগও ইলম না থাকার কারণে। নিশ্চয় দ্বীন যিন্দেগির সকল শাখা-প্রশাখাকে শামিল রাখে। কিন্তু এরই সাথে কাজের বণ্টনও স্বভাবগত ও শরয়ী একটি নিয়ম। যেমন কিছু লোক পড়া-পড়ানোতে নিয়োজিত। আবার একদল জিহাদে মশগুল। অন্যান্যরা অন্যান্য বিভাগ ও সেক্টরে কাজ করছে। ঠিক তেমনি তাবলীগ জামাতের মুরব্বিরা আপন অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে 'ছয় নম্বর' নির্বাচিত করেছেন। এগুলো দ্বারা সাধারণ উম্মতের ইসলাহ ও যিন্দেগিতে আমূল পরিবর্তন আসে; সাধারণ উম্মতের তারবিয়াত ও ইসলাহ বা সংশোধন হয়ে যায়। যিন্দেগির প্রত্যেকটি সেক্টরে মানুষ দ্বীনের উপর চলার চেষ্টা করে।

আমার সামনের
একটি ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ

ঘটনাটি এই—একবার শহীদ মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবি রাহ. এর কাছে একজন ট্যাক্সিচালক এসে তাঁকে ট্যাক্সির ভাড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। সে ওইসব ড্রাইভার সম্পর্কে জানতে চাইল; যারা মিটার নষ্ট করে রাখে এবং আরোহীদের সাথে ধোঁকাবাজি করে। হযরত তার প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! তুমি এত দীর্ঘকাল থেকে ট্যাক্সি চালাচ্ছ কিন্তু এখন হঠাৎ করে অন্তরে হালাল-হারামের খেয়াল কেমন করে সৃষ্টি হল?

সে বলল, হযরতজি! আল্লাহ আমাকে তাবলীগ জামাতে যাওয়ার তাওফিক দিয়েছিলেন। আর তখন থেকেই আমার হারাম-হালালের ফিকির হতে লাগল। কারণ আল্লাহর হুকুম হল—হালাল রুজি করো; হালাল খাও। হালাল খাওয়াও এবং হালাল খরচ করো। এ কারণেই আমি আপনার কাছে এসব মাসআলা জানতে চাচ্ছি, যাতে হারাম থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

এ ছাড়া তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর মালফূযাত ও বয়ানসমূহে জায়গায় জায়গায় এর আলোচনা রয়েছে যে, যেসব হযরত ইলমের খেদমতে রয়েছেন তাঁরাও দ্বীনের কাজ করছেন। যাঁরা জিহাদে মশগুল এঁরাও দ্বীনের কাজ করছেন। আর আমি আপনাদেরকে দ্বীনের এ কাজে জোড়ার কথা বলছি।

আমি এ কয়েকটি সন্দেহ ও এর জবাব নমুনা হিসাবে পেশ করলাম। কেউ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. এর কিতাব—

১. তাবলীগ জামাতের উপর কয়েকটি অভিযোগ ও এর জবাব।

২. আল-এতেদাল।

৩. ফাযাইলে তাবলীগ।

এগুলো দেখে নিতে পারেন।

মোটকথা, আমি এ জামাতকে মুখলিস ও নিষ্ঠাবান মনে করি। যাঁদের খেদমতের ফায়দা হুকুমাত ও জনগণ উভয়েই ভোগ করছে। ولا ازكى على الله احدا

সাথে এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, তাবলীগ জামাত একটি খোলা কিতাব, এর কোনো বিষয় গোপন নয়। যে কেউ কাছ থেকে এ কিতাবকে পড়তে পারে। তাবলীগ জামাত সম্পর্কে কারো মনে কোনো সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে সে যেন তাবলীগের মারকাযসমূহে গিয়ে এর ইজতেমাগুলোতে শরীক হয়ে তাঁদের বয়ান শুনে। খেয়াল করে শুনে—তাঁরা কী বলে? তাঁদের সাথে সময় লাগিয়ে দেখে—তাঁরা কী করে? এভাবে এ জামাতের বড়দের সাথে ওঠা-বসা ও মেলামেশা করে তাঁদের সম্পর্কে জানে।

একজন

আরব যুবকের কথা

আরবের একজন যুবক। ১৯৯৫ সালে আমেরিকা সফরকালে শিকাগোর একটি মসজিদে তাঁর সাথে আমার দেখা।

ঘটনা ছিল এই—

একদিন আমি আমার সাথীদের সঙ্গে একটি মসজিদে এশার নামায পড়লাম। মসজিদ নামাযিতে ভরপুর ছিল। দেখে আমি খুবই খুশি হই। নামাযের পর কেউ বলল, এখানে আরবের এক জামাত এসেছে। আমি তাঁদের সাথে মোলাকাত করতে যাই। পরিচয় হল। আমার বাড়ি পাকিস্তান শুনে আমীর সাহেব আমার হাত ধরে আলাদা একটি জায়গায় নিয়ে বসে আমাকে তাবলীগ জামাত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। আমি আমার জানামতে এগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি। তখন ওই আরব যুবক বলেন, ওহে শায়খ! আমার দেশে কেউ কেউ এ জামাতের বিরোধিতা করে। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, আমি এসব দেশে এ জামাতের যে ভালো প্রভাব ও কার্যক্রম দেখতে পাচ্ছি, তা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, **তাবলীগ জামাত হচ্ছে হক একটি জামাত।**

এ আরব যুবকের 'ভালো প্রভাব' বলার অর্থ হল 'ইসলামি মাযাহির' যা ওইসব দেশে দেখা যায়। অর্থাৎ মুসলমান সংখ্যায় কম হওয়ার পরও দ্বীনের প্রতি তাঁদের মনোযোগ; নিজের ও ভবিষৎ প্রজন্মের ঈমান ও ইসলাম নিয়ে ফিকির ও চিন্তা করা; জায়গায় জায়গায় মসজিদ নির্মাণ এবং মসজিদসমূহে কুরআন শিক্ষার লক্ষ্যে মক্তব চালু করা ইত্যাদি। এসব দেশে মুসলমানরা মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়ে এবং বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে মক্তবে কুরআন শরীফ ও দ্বীনি মাসাইল শিক্ষা দেয়। এটা হচ্ছে ওই জামাতের মেহনতের ফল। অথচ পূর্বে এরা পাশ্চাত্য-সংস্কৃতি ও বস্তুবাদি কালচারে এত বেশি নিমগ্ন ছিল যে, এদের দ্বীন ও ঈমানের পর্যন্ত কোনো খবর ছিল না।

এখন এরা ওই জামাতের মেহনতের বরকতে দ্বীনের প্রতি মনোযোগী হয়ে নিজেদের মসজিদের জন্য মুসলিম দেশসমূহ থেকে আলিম, খতীব ও ইমাম এবং মক্তবসমূহের জন্য হাফিয, কারী এনে থাকে। যাতে এঁদের কাছ থেকে তারা দ্বীন শিখতে পারে।

দ্বিতীয় সাক্ষী একজন বড় আলিমে দ্বীনের। যিনি একটি আরবদেশের অধিবাসী। নাম হল, শায়খ সালেহ বিন আলী আশ শুওয়াইমান। তিনি নিজে রায়বেণ্ডের বার্ষিক ইজতেমায় শরীক হয়ে এর রিপোর্ট নিজ দেশের প্রধান মুফতীর সামনে পেশ করেন। রিপোর্টটি এই—

তাবলীগ জামাত সম্পর্কে

শায়খ সালেহ বিন আলী আশ শুওয়াইমান সাহেবের রিপোর্ট

এ রিপোর্টটি তিনি ১৪০৭ হিজরিতে পেশ করেছিলেন। রিপোর্টটি جلاء الأذهان عما اشتبه في جماعة التبليغ لبعض أهل الإيمان নামক পুস্তক থেকে সংগৃহীত। যা কয়েকটি চিঠিসমগ্র। এগুলো মাওলানা গোলাম মস্তফা হাসান সাহেব জমা করেছেন। আর মাকতাবায়ে মাহমুদিয়া ফয়সালাবাদ থেকে প্রকাশিত।

<u>বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম</u>

ইফতা ও দাওয়াহ বিভাগের প্রধান, সৌদী আরবের জাতীয় মুফতী, আমার পিতা শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায সমীপে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে হেফাযত করুন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আম্মাবাদ,

আমি ০১.০৩.১৪০৭ হিজরি তারিখে বিদায় নিয়ে ০৩.০৩.১৪০৭ হিজরি তারিখে উলামা ও তালাবার এক জামাতসহ পাকিস্তান সফরে রওয়ানা হই। যাঁরা দেশের বিভিন্ন ভার্সিটি তথা জামেয়া ইসলামিয়া মদিনা মুনাওয়ারা; জামেয়া ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ আল-ইসলামিয়া ও জামেয়াতুল মালিক সউদসহ অন্যান্য ভার্সিটির উস্তাদ ও ছাত্রবৃন্দ।

এ সফরে আমি আশ্চর্য বিষয়াবলি প্রত্যক্ষ করি। আমরা লাহোর বিমানবন্দরে অবতরণ করলে ওখানে এমন একদল নেককার নওজওয়ান আমাদেরকে স্বাগত জানায়, যাঁদের চেহারা ও দাড়ি থেকে ইলম ও ঈমানের নূর চমকাচ্ছিল। বিমানবন্দরের মসজিদে পৌঁছে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করে আমরা সবাই একত্রে বসে পড়ি। আমরা ছিলাম বিভিন্ন দেশের অধিবাসী। এবার তাঁদের মধ্য থেকে একজন যুবক দাঁড়িয়ে এমন বয়ান দিতে শুরু করল, যা আমাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করছিল। আমরা সবাই মুগ্ধ হচ্ছিলাম। এমন সময় গাড়ি এসে গেল। আমরা রায়বেণ্ডের দিকে যাত্রা করি। যেখানে বার্ষিক ইজতেমা হয়। এ ইজতেমা এমন সুশৃঙ্খল ও সুন্দর ছিল, যা দেখে অন্তরে বিনয় সৃষ্টি হয়। চোখের সামনে জাহান্নামের ভয়ানক দৃশ্য ও জান্নাতের সুখময় স্মৃতি ভেসে ওঠে। এরই সাথে আল্লাহর ভয়ে চোখ দিয়ে বৃষ্টির ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। এ ইজতেমা ছিল জান্নাতের ইজতেমা সদৃশ। যেখানে নেই কোনো শোরগোল আর না কোনো কষ্ট। না কোনো বেহুদা কথা আর না অন্যায় ও মিথ্যা কথা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। নেই কোনো দুর্গন্ধ, আর না কোনো অপরিচ্ছন্নতা ও গান্দেগি। সকল বিষয় মেধা ও রুচি দিয়ে সাজানো। ওখানে নেই

কোনো ট্রাফিক। আর না কোনো পুলিশ ও পাহারাদার। অথচ ইজতেমায় আগত লোকের সংখ্যা দশ লক্ষাধিক।

ওখানে প্রাকৃতিক ও পবিত্র যিন্দেগি। সর্বত্র আল্লাহর যিকিরের পরিবেশ বিরাজমান। দিনরাত সবসময় ইলমি আলোচনা, দারস ও যিকরুল্লাহর মজমা চলছে। সেখানে দাওয়াত, তালীম, যিকির ও ইবাদত সবকিছু রয়েছে। আল্লাহর কসম! এমন এক ইজতেমা। যেখানে দিল যিন্দা হয়। ঈমান চমকায় ও বৃদ্ধি পায়।

কত প্রভাব বিস্তারকারী সুন্দর ইজতেমা! যা আপনার সামনে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তবয়ে তাবেয়ীনের কথা বলার দৃশ্যকে পেশ করবে। যেদিকেই তাকাবেন আপনি মেহনত, মুজাহাদা, যিকির, মিষ্ট কথা, সুন্দর আমল ও উন্নত ইসলামি চাল-চলন দেখবেন। আপনি ওখানে ইলম ও আমল দ্বারা আলোকিত এবং নূরানী উজ্জ্বল চেহারাসমূহ দেখতে পাবেন। আপনি ওখানে কেবল তাওহীদ, যিকির, তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর, কুরআন করীমের তেলাওয়াত, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ও জাযাকুমুল্লাহু খায়রা যেমন বাক্যাবলি শুনতে পাবেন।

ওখানে আপনি এমনসব জিনিস দেখতে পাবেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে; আপনার অন্তর খুশিতে বাগবাগ হবে। তা হচ্ছে মুহাম্মদ মুস্তফা সা. এর সুন্নাতসমূহকে তরতাজা ও যিন্দাকরণ; যা আপনি প্রতি মুহূর্তে সর্বস্থানে দেখে আনন্দ উপভোগ করতে থাকবেন। তা কত সুন্দর ও কতই না উত্তম ও আজিমুশ্বান ইজতেমা।

মোটকথা, ওখানে কুরআনে করীম ও সুন্নাতে রাসুলের আমলি নমুনা নজরে ভাসে। কতই না পুত-পবিত্র, সুন্দর ও পুণ্যময় জীবন ওখানে!

আমার মনে বারবার এ আকাঙ্ক্ষা জাগে, হায়! এরকম দাওয়াতি ইজতেমা যদি সৌদী আরবে অনুষ্ঠিত হত। কারণ সকল ভালো কাজ তো এদেশের জন্যই মানায়। আর মরহুম বাদশাহ আবদুল আযীয থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সকল উত্তম ও ভালো কাজে আমাদের দেশ তো আগে আগে রয়েছে।

এ মহান ইজতেমায় সমবেত মুসলমান– যাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ছিল– সবার একই লেবাস, একই চরিত্র, একই কথা ও একই উদ্দেশ্য। যেন এঁরা সবাই একই পিতার সন্তান। অথবা মনে হবে—আল্লাহপাক একটি অন্তর সৃষ্টি করে এঁদের সবার মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন।

এঁদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল, 'দ্বীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা, মুসলমানদের ইসলাহ ও সংশোধন। আর অমুসলিমদেরকে আল্লাহর রাস্তা দেখানো'। তাজ্জব কথা হল, এমন নেককারদের বিরুদ্ধে অহেতুক খবর রটনাকারীরা কেন ভুল কথার আশ্রয় নেয় ???

এসকল লোকদের ব্যাপারে শায়খ আবদুল মাজীদ যিন্দানি কত সুন্দর কথা বলেছেন **'এঁরা আসমানী মাখলুক; যাঁরা জমিনে চলে'**।

এরপর কার এমন বুকের পাটা হবে যে, এঁদেরকে খারাপ বলবে? আর এমনসব মিথ্যা অপবাদ আরোপের সাহস করবে যা ওঁদের মধ্যে মোটেই নেই।

আমার মতে, এ জামাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ওই, যা আমাদের দেশের। আর তা হল, 'দুনিয়ার মানুষের সংশোধন এবং দুনিয়ার সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ চালু করা'। এখন আপনিই বলুন! তাঁদের কোন কাজ ও কোন কথা আপত্তিকর হতে পারে?

এখন আবার ইজতেমার আলোচনায় আসি। এশার পর ইজতেমা শেষ হলে তখন ডানে বামে যেদিকেই তাকাবেন শুধু বিভিন্ন ইলমি হালকা দেখতে পাবেন। এঁদের যে হালকায়ই আপনি বসবেন মজা ও স্বাদ অনুভব করবেন। ওখান থেকে কোনো না কোনো ফায়দা নিয়েই উঠবেন। এরপর ঘুমের সময় এলে চারদিকে নিস্তব্ধতা ও পিনপতন নিরবতা। একটি শান্তিময় অবস্থা। আপনি এঁদের দিকে তাকালে মনে হবে স্থানে স্থানে খুঁটি দাঁড়িয়ে রয়েছে; তখন কিন্তু এঁরা নামাযে মশুগল। রাতের শেষ প্রহর হলে তখন মৌমাছির ন্যায় ভনভনানির শব্দ। সবদিক থেকে আহাজারি ও রোনাজারির আওয়ায। তখন এঁরা কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে বিনয়সহকারে দুআ করছে— 'হে আল্লাহ তুমি আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। দুনিয়ার সকল মানুষকে হেদায়াত দাও। তাদেরকে তোমার নবী মুহাম্মদ মস্তফা সা. এর সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফিক দাও। তাঁদের দ্বারা তোমার নবীর সুন্নাতগুলো যিন্দা করো'।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটা এমন এক ইজতেমা; যেখানে সকল আলিম ও সকল ছাত্রের শরীক হওয়া উচিত; বরং সকল ওই মুসলমানের ওখানে আসা চাই যারা অন্তরে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতে জান্নাতে যাওয়ার আশা পোষণ করে। আল্লাহ তাআলা এমন ইজতেমার যিম্মাদার হযরাতদেরকে উত্তম বদলা দিন এবং তাঁদেরকে এমন কাজের উপর অটল ও অবিচল রাখেন। তাঁদের সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করেন। সর্বোপরি তাঁদের দ্বারা দুনিয়ার সকল মুসলমানের ফায়দা পৌছান।

এবার ওইসব লোক সম্পর্কে একটু শুনুন, যারা ইজতেমায় আগত মুসলমানদের খেদমতে নিয়োজিত। এঁদের প্রত্যেক আগাগোড়া দ্বীনদারিতে নিমগ্ন। আটা তৈরিতে লিপ্ত ব্যক্তির যবানেও আল্লাহর নাম, তাসবীহ ও তাকবীর জারি। রুটি বানানেওয়ালার যবানে শুনতে পাবেন আল্লাহর যিকির- আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহর মতো বাক্য। তরকারি পাকানেওয়ালার যবানে আল্লাহর নাম, আল্লাহর যিকির, তাসবীহ-তাহমীদ ও তাকবীর জারি রয়েছে।

এসব অবস্থা আমি ওই সময় নিজের চোখে দেখেছি; নিজের কানে শুনেছি, যখন আমাদের আগমন সম্পর্কে তাঁদের কোনো খবর ছিল না। আর না তাঁদের জানা ছিল যে, আমরা তাঁদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করয়ী বা শুনছি। পবিত্র ওই সত্তা যিনি তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁদেরকে আপন যিকিরের তাওফিক দিয়েছেন। তাঁদেরকে সরল সঠিক পথ দেখিয়েছেন। যা সকল মুসলমান তামান্না করে থাকে।

মহামান্য শায়খ! হাকিকত হল এই, যে ব্যক্তিই এ জামাতে শরীক হবে, তাঁদের সুহবতে যাবে, তাঁদের কাছে অবস্থান করতে থাকবে—সে অবশ্যই অবশ্যই বাস্তবিকই দায়ী ইলাল্লাহ বা আল্লাহর পথে আহবানকারী হবে।

হায়! আমি যখন ভার্সিটির ছাত্র ছিলাম—ওই সময় যদি এ জামাতের সাথে পরিচয় হত, তাহলে আজ আমি একজন দায়ী ও সকল ইলমে জ্ঞানী হতে পারতাম।

আল্লাহর কসম! তাঁদের ব্যাপারে আমার এটাই বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং কিয়ামতের দিন 'যখন ধন সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না' সেদিন যদি আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে তখনো আমি এই জবাবই দেব।

শায়খ, হায়! যদি ওইসব দায়ী যাঁরা আপনার মোবারক বিভাগে কাজ করে থাকে, এই ইজতেমায় শরীক হত এবং ওই জামাতের সাথে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ইখলাস ও দাওয়াতের পদ্ধতি শিখতে পারত, তাহলে তাঁরা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তবয়ে তাবেয়ীনের আখলাক ও চরিত্র জানতে পারত।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে এই দুআ— হে আল্লাহ! আমাদেরকে হক দেখাও। হকের অনুসরণ করার তাওফিক দাও এবং আমাদেরকে নফস, শয়তান ও খাহেশাতের ধোঁকা ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো; তোমার দ্বীনের সাহায্য করো; হকের কালেমা বুলন্দ করো; আমাদের হুকুমাতকে ইসলামের মাধ্যমে ইযযত ও সম্মান দাও এবং তাঁদের মাধ্যমে ইসলামের ইযযত বর্ধিত করো! আর আল্লাহই হলেন সবকিছুর নিয়ন্ত্রক ও সবকিছুতে সক্ষম।

وصلى الله على نبينا محمد وآله واصحابه

শায়খ সালেহ বিন আলী আশ শুওয়াইমান
দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগের প্রতিনিধি
সৌদী আরব

তাবলীগ জামাত সম্পর্কে
শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বাযের মন্তব্য

এ রিপোর্টের জবাবে শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায রাহ. শায়খ সালেহকে ১৭.০৮.১৪০৭ হিজরিতে যে চিঠি লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আবদুল আযীয বিন বাযের পক্ষ থেকে রুহানি সন্তান, মুহতারাম শায়খ সালেহ বিন আলী আশ শুওয়াইমানকে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন—আল্লাহপাক আপনাকে মোবারক বানান। আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আম্মাবাদ,

আমি আপনার পেশকৃত রিপোর্টটি মনোযোগসহকারে পড়েছি। এতে আপনি ও আপনার সফরসাথী উলামা তালাবা— যাঁদের সম্পর্ক জামেয়া ইসলামিয়া মদিনা মুনাওয়ারা, জামেয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ও জামেয়া মালিক সউদসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে রয়েছে— এ ইজতেমায় শরীক হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন। যা ১৪০৭ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে তাবলীগ জামাতের উদ্যোগে রায়বেণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়। আমি আপনার লিখিত রিপোর্ট পড়েছি এবং একে পরিপূর্ণ শান্তনাদায়ক ও যথেষ্ট পেয়েছি। এ রিপোর্টে ওই ইজতেমার এমন সূক্ষ্ম চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে পাঠকের মনে এতে শরীক হওয়ার আগ্রহ জন্মে এবং রিপোর্টটির পাঠকারী অনুভব করবে যে, সে লেখকের সাথে নিজেও তা প্রত্যক্ষ করছে।

আমি এতে খুবই খুশি হয়েছি যে, আপনারা সকলে এ ইজতেমা থেকে অনেক ফায়দা হাসিল করে এসেছেন এবং এ জামাতের যিম্মাদারদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম বদলা দিন। এ ধরনের ইজতেমা যেন আরো বেশি অনুষ্ঠিত হয় এবং এগুলোর দ্বারা আল্লাহ মুসলমানদেরকে ফায়দা পৌছান।

নিঃসন্দেহে এ মুহূর্তে এ ধরনের পবিত্র ইজতেমা মুসলমানদের খুবই প্রয়োজন। যেখানে আল্লাহ তাআলার সত্তার আলোচনা হবে, যেখানে ইসলামকে মজবুত করে ধরার, ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করার এবং তাওহীদকে বেদআত ও অহেতুক বিষয়াদি থেকে পুতপবিত্র রাখার দাওয়াত হবে।

আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ তিনি সকল মুসলমানকে সে শাসক হোক বা প্রজা—এ ফরযকে পরিপূর্ণ আদায় করার তাওফিক দিন। إنه جواد كريم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

প্রধান কর্মকর্তা

ইফতা, দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগ, সৌদী আরব

৪৮-৬১

হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রাহ. লিখিত

তাবলীগি কাজের কর্মপদ্ধতি

আল্লাহপাক তো বাদশাহি ও সম্পদের মধ্যে মানুষকে লাঞ্ছিত করে দেখিয়েছেন। এরই সাথে দরিদ্রতার মধ্যে ইযযত ও সম্মান দিয়ে দেখিয়েছেন। মানুষের আভ্যন্তরীণ সম্পদ হচ্ছে তার ইয়াকিন ও বিশ্বাস এবং তার আমল।। মানুষের ভিতরের আমল ও ভিতর থেকে বের হওয়া আমল ঠিক হয়ে গেলে আল্লাহপাক ভিতরের কামিয়াবির অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। যদিও এর বাহ্যিক অবস্থা দুর্বল ও নাজুকই হোক। ....

ছোট-বড়, ধনী-গরিব, কৃষক, ব্যবসায়ী, মজদুর, মালিক সবাই মসজিদে এসে যিন্দেগি চালানো শিখত। আর বাইরে গিয়ে নিজ নিজ কাজে মসজিদের শিক্ষার উপর চলত। আজ আমরা ধোঁকায় পড়ে গেছি। আমাদের টাকা-পয়সায় মসজিদ চলে। বর্তমানে মসজিদ আমল থেকে খালি আর আসবাবে ভরপুর। রাসূল সা. মসজিদকে টাকাওয়ালাদের নিয়ন্ত্রণে ছাড়েন নি। রাসূল সা. এর মসজিদে না ছিল বাতি, না ছিল পানি। আর না ছিল গোসলখানা। ....

হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালবি রাহ. লিখিত

তাবলীগি কাজের কর্মপদ্ধতি

তাবলীগ জামাতের সাবেক আমীর হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালবি রাহ. এর ওই চিঠি বিস্তারিতভাবে পেশ করা হচ্ছে। যা তিনি তাবলীগের ওই জামাতের উদ্দেশে লিখেছিলেন; যারা হারামাইন শরীফাইনের উমরা ও যিয়ারতের জন্য গিয়েছিল।

এ চিঠিতে হযরতজি দাওয়াত ও তাবলীগের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি, কাজের রূপরেখা ও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সাধারণ আদব উল্লেখ করেছেন। হযরতের এ চিঠি প্রত্যেক ওই জামাতের জন্য উপকারী ও পথপ্রদর্শনের কাজ দেবে যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য বের হয়। এ ছাড়া ওইসকল লোকের পথপ্রদর্শন করবে; যাঁরা তাবলীগ-জামাতের মূলনীতি, কাজের রূপরেখা, মাকসাদ ও নিয়মনীতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

এ চিঠিটি হযরতজি ইউসুফ কান্ধালবি রাহ. এর জীবনীর ৭৬৫-৭৯১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। জীবনীটি লিখেছেন মাওলানা মুহাম্মদ সানি হাসানি। যা ১৯৭৮ সালে মাকাতাবায়ে ইসলামিয়া করাচি থেকে ছাপা হয়েছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর সম্মানিত বান্দাগণ! আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর রাস্তায় বেশি বেশি করে চেষ্টা করার তাওফিক দিন এবং আমাদের ও তোমাদেরকে সঠিক কাজের প্রতি দিক নির্দেশ করেন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহর দরবারে আশা— আপনারা সুস্থ আছেন। আপনাদের দ্বীনি কাজের ব্যাপারে চেষ্টা-প্রচেষ্টার সংবাদ আনন্দদায়ক ও দ্বীনি কাজে শক্তিবর্ধক। আল্লাহপাক কবুল করুন; গ্রহণ করুন; তরক্কি দান করুন; সহীহ পথের উপর আপনাদের হেফাযত করুন এবং এ কাজের সকল বিষয় বুঝার তাওফিক দান করুন। আমীন।

কামিয়াবি ও না-কামির মাপকাটি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের সবধরনের সফলতার নির্ভর তার অভ্যন্তরীণ যোগ্যতার উপর রেখেছেন। সফলতা ও বিফলত মানুষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার নাম। বাইরের জিনিসের নকশার নাম সফলতা বা বিফলতা নয়। ইযযত-সম্মান, আরাম, কষ্ট, পেরেশানি ও সুকুনত, সুস্থতা-অসুস্থতা হচ্ছে মানুষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার নাম। এসব অবস্থা তৈরি হওয়া ও নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে বাইরের কোনো মত ও পথের সম্পর্ক নেই। আল্লাহপাক তো বাদশাহি ও সম্পদের মধ্যে মানুষকে লাঞ্ছিত করে দেখিয়েছেন। এরই সাথে দরিদ্রতার মধ্যে ইযযত ও সম্মান দিয়ে দেখিয়েছেন।

মানুষের আভ্যন্তরীণ সম্পদ হচ্ছে তার ইয়াকিন ও বিশ্বাস এবং তার আমল। মানুষের ভিতরের আমল ও ভিতর থেকে বের হওয়া আমল ঠিক হয়ে গেলে আল্লাহপাক ভিতরের কামিয়াবির অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। যদিও এর বাহ্যিক অবস্থা দুর্বল ও নাজুকই হোক।

আল্লাহর উপর ঈমান

আল্লাহপাক হলেন দুনিয়ার ছোট থেকে ছোট এবং বড় থেকে বড় সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। সবকিছুর মালিক। তিনি সবকিছু বানিয়েছেন আপন কুদরত দিয়ে। সবকিছু তাঁরই সৃষ্টির কারণে হয়েছে। তিনি সবকিছু বানানেওয়ালা; অথচ তাঁকে কেউ বানায় নি। যে নিজে অন্যের মাধ্যমে বনেছে তার দ্বারা কোনো কিছু বনতে পারে না; কোনো কাজ হতে পারে না। যা কিছু কুদরত দ্বারা বনেছে—তা কুদরতের নিয়ন্ত্রণে। সবকিছুতে রয়েছে আল্লাহর কবজা। আল্লাহর ক্ষমতা। তিনিই সব জিনিসকে ব্যবহার করেন। তিনি আপন কুদরত দ্বারা ওইসব জিনিসের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারেন। লাকড়িকে অজগর বানাতে পারেন। আবার অজগরকে লাকড়িও বানাতে পারেন। এরকম প্রত্যেক আকৃতি তা মাল হোক বা দেশ; বিজলি হোক বা বাতাস—সবকিছু তাঁরই কবজায়। এগুলোতে তিনিই হস্তক্ষেপ করেন; তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন; তিনিই পরিচালনা করেন। তিনিই আবাদিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেন; আবার ধ্বংসস্তূপ থেকে আবাদিও গড়ে তোলেন। মানুষ দেখে ধ্বংস আর তিনি গড়েন আবাদি, আবার মানুষ দেখে আবাদি আর তিনি করেন ধ্বংস। তিনি মুহূর্তে সকল সাজ-সজ্জা ও সামান বিগড়িয়ে দেন।

রাসূলের প্রতি ঈমান

আল্লাহর মহান সত্তার সাথে যেন মানুষের সম্পর্ক হয়ে যায়। আল্লাহর কুদরত থেকে সরাসরি ফায়দা হাসিল করতে পারে। এ লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সা. আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূরানী তরীকা নিয়ে এসেছেন। যখন মানুষ তাদের জীবন পরিচালনায় এ তরীকার অনুসরণ করবে; সবাই এ তরীকায় এসে যাবে, তখন তাদের প্রত্যেক কাজে আল্লাহপাক কামিয়াবি ও সফলতা দেখাবেন।

ঈমান ও ইয়াকিনের ফলাফল ও এর দাওয়াত

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র মধ্যে নিজের ইয়াকিন ও বিশ্বাস, নিজের জযবা ও আবেগ, নিজের তরীকা ও জীবনপদ্ধতি বদলের আহবান ও আবেদন রয়েছে। কেবল ইয়াকিন ও বিশ্বাস পরিবর্তনের উপরই আল্লাহপাক এ জমিন-আসমানের চেয়ে কয়েকগুণ বড় জান্নাত প্রদান করবেন। আসবাবের উপর থেকে ইয়াকিন সরিয়ে আল্লাহর জাত ও সত্তার উপর ইয়াকিন মজবুত করলে দুনিয়ার সকল আসবাব ও বস্তু আল্লাহপাক তোমার অনুগত ও বাধ্য করে দেবেন।

ইয়াকিন নিজের মধ্যে পয়দা ও সৃষ্টি করতে হলে, একে তো বেশি বেশি করে ইয়াকিনের দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহর বড়ত্ব মানুষকে বুঝাতে হবে। আল্লাহর

রুবুবিয়াত, আল্লাহর কুদরত বুঝাতে হবে। আম্বিয়ায়ে আলাইহিস সালাম ও সাহাবা কেরামের ঘটনাবলি শুনাতে হবে। নিজে একাকী বসে এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও ফিকির করতে হবে। দিলে ওই জিনিসের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে—যা মজমায় দাওয়াত দেবে। এটা হক বলে ইয়াকিন রাখতে হবে। এরপর আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে দুআ করবে— হে আল্লাহ! আমার মধ্যে ইয়াকিনের হাকিকত সৃষ্টি করে দাও।

নামাযের এহতেমাম ও এর দাওয়াত

সরাসরি আল্লাহপাকের কাছ থেকে ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে নামায নামক আমল দেওয়া হয়েছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নির্ধারিত নিয়মে শর্তাবলিসহ ব্যবহার করো। চোখ, কান, হাত, যবান, পা সবগুলোর ব্যবহার যেন সঠিক হয়। আর দিলে আল্লাহর ধ্যান, ভয় থাকবে। সাথে এ কথার বিশ্বাস রখবে যে, নামাযে আল্লাহর হুকুম মোতাবিক আমার সকল কাজ– তাকবীর, তাসবীহ, রুকু, সেজদা ইত্যাদি সারা দুনিয়া থেকেও বেশি পুরস্কার প্রদানকারী। এমন ইয়াকিন ও বিশ্বাসসহ নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে হাত তোলে দুআ করে দেখো- আল্লাহ আপন কুদরত দ্বারা তোমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবেন। এমন নামায দ্বারা আল্লাহপাক সকল গুনাহ মাফ করে দেন। রিযিকে বরকত দেন। এবাদত-বন্দেগির তাওফিক দেন।

এমন নামায শিখতে হলে অন্যকে খুশূ খুযূওয়ালা নামাযের দাওয়াত ও উৎসাহ দিতে হবে। নামাযেই দুনিয়া আখিরাতের সকল ফায়দা ও কল্যাণ নিহিত—এ কথা বিশ্বাস রাখতে হবে। রাসুল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের নামাযের অবস্থা বেশি বেশি করে শুনাতে হবে। সাথে সাথে নিজে এমন নামায পড়ার চেষ্টা করতে হবে। ইহতেমাম ও গুরুত্বসহকারে ওযু করবে। এরপর কিয়াম, রুকু-সেজদা ও বৈঠকে ধ্যান জমাবে। অন্তত তিনবার এমন ধ্যান জমাবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। নামাযের পর এ কথা মনে করবে যে, আল্লাহর শান মতো নামায হয়নি। এজন্য কেঁদে কেঁদে বলবে, হে আল্লাহ! আমার নামাযে হাকিকত পয়দা করে দাও।

ইলম ও যিকির

ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হল আমাদের মধ্যে তাহকিক ও তালাশের জযবা ও আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া। আমার আল্লাহ আমার কাছে এখন কী চান। এর পর আল্লাহর ধ্যানসহ নিজেকে ওই আমলে লাগানোর নামই হচ্ছে যিকির। যে ব্যক্তি দ্বীন শিখতে সফরে বের হয় তাঁর ওই সফরকে ইবাদত হিসাবে লেখা হয়। তালিবে ইলম বা দ্বীন শিক্ষাকারীর পায়ের নিচে সত্তর হাজার ফেরেশতা আপন ডানা বিছিয়ে দেন। জমিন ও আসমানের সকল মাখলুক তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করতে থাকে। শয়তানের জন্য একজন আলিম হাজার আবিদের চেয়েও ভারি ও ওজনদার। অন্যদের মধ্যে ইলমের আগ্রহ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট থাকবে। ইলমের ফযীলত ও গুরুত্ব শুনাতে থাকবে। নিজে ইলমের হালকায় বসবে এবং উলামায়ে কেরামের খেদমতে হাজির

হবে। এটাকেও ইবাদত বলে ইয়াকিন ও বিশ্বাস করবে। এরই সাথে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে চাইবে— হে আল্লাহ! আমাকে ইলমের হাকিকত দান করো।

প্রত্যেক আমলে আল্লাহর ধ্যান অর্জনের জন্য আল্লাহর যিকিরের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাঁকেও স্মরণ করেন। যতক্ষণ মানুষের ঠোঁট আল্লাহর যিকির দ্বারা নড়াচড়া করতে থাকবে ততক্ষণ আল্লাহপাক তাঁর সাথে থাকেন। আল্লাহপাক এমন ব্যক্তিকে তাঁর মহব্বত, ভালবাসা ও মারিফত দান করেন। আল্লাহর যিকির হচ্ছে শয়তান থেকে হেফাযতের ঘাটি। নিজের মধ্যে আল্লাহর ধ্যান সৃষ্টি করতে হলে অন্যকে আল্লাহর যিকিরের প্রতি দাওয়াত দেবে। অন্যকে যিকিরের তারগীব ও উৎসাহ দেবে। নিজে এ ধ্যান করে- যে আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন- যিকির করবে। আর কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দুআ করবে- হে আল্লাহ! আমাকে যিকিরের হাকিকত দান করো।

ইকরামে মুসলিম

প্রত্যেক মুসলমানকে রাসূল সা. এর উম্মত হিসাবে ইকরাম করতে হবে। প্রত্যেক উম্মতের সামনে ছোট হতে হবে; বরং প্রত্যেক মানুষের সামনে নিজেকে ছোট মনে করবে। সকল মানুষের হক আদায় করবে তবে নিজের হক চাইবে না। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ লুকিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাঁর কাজে লেগে থাকেন। যে নিজের হক মাফ করে দেয় আল্লাহ তাঁকে মর্যাদা ও সম্মান দান করেন। উৎসাহ ও তারগীব দিয়ে অন্যের মধ্যে ইকরামে মুসলিমের আগ্রহ সৃষ্টি করবে। মুসলমানের মর্যাদার আলোচনা করবে। রাসুল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের আখলাক-চরিত্র এবং সহমর্মিতা, আত্মদান ও নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ঘটাবলি শুনাবে। নিজে এর মশক ও অনুশীলন করবে। আবার আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে নিজের মধ্যে রাসূল সা. এর আখলাক সৃষ্টির জন্য দুআ করতে থাকবে।

সহীহ নিয়ত

প্রত্যেক আমলে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত থাকে। কোনো আমলের উদ্দেশ্য যেন দুনিয়া হাসিল বা নিজের মর্যাদা ও অবস্থান তুলে ধরা না হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সামান্য আমল দ্বারা অনেক পুরস্কার ও বদলা পাওয়া যায়। সহীহ নিয়ত ছাড়া অনেক বড় বড় আমলও বিফলে যায়। নিজের নিয়ত সহীহ করার জন্য দাওয়াতের মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে নিয়ত সহীহ করার আগ্রহ ও ফিকির সৃষ্টি করবে। নিজে আমল করার পূর্বে ও আমল করাকালীন নিয়ত ঠিক করার অনুশীলন করবে। মনে মনে বলবে, আমি আমল করয়ী আল্লাহকে রাযি-খুশি ও সন্তুষ্ট করার জন্য। আমল শেষ করে নিজের নিয়তকে ত্রুটিযুক্ত মনে করে তাওবা ইস্তেগফার করতে থাকবে। এরই সাথে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে ইখলাস ও সহীহ নিয়তের জন্য দুআ করতে থাকবে।

আল্লাহর রাস্তায় মেহনত ও দুআ

বর্তমানে উম্মতের মধ্যে একা একা আমল করার প্রচলন রয়েছে ঠিকই তবে এগুলোর হাকিকত নেই। রাসূল সা. এর খতমে নুবুওয়াতের বরকতে এ উম্মত

দাওয়াতওয়ালি মেহনত পেয়েছিল। যাতে আল্লাহর বান্দাদের সম্পর্ক আপন রবের সাথে হয়ে যায়। এর জন্য নবীদের নিয়মে নিজের জান-মাল কুরবান করে দেবে। তবে যাদের মধ্যে মেহনত করবে—তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার আশা করবে না। এর জন্য হিজরত ও করতে হবে আবার নুসরতও করতে হবে। যে জমিনওয়ালাদের উপর রহম ও দয়া করবে তাঁর উপর আসমানওয়ালা রহম ও দয়া করবেন। যে অন্যকে আল্লাহর সাথে জোড়ানোর লক্ষ্যে ঈমান ও নেক আমলের মেহনত করবে—আল্লাহপাক প্রথমে তাকেই ঈমান ও নেক আমলের তাওফিক দিয়ে নিজের সাথে সম্পর্কিত করে নেবেন। এ রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল বের হওয়া সারা দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে এসব থেকেও উত্তম। আল্লাহর রাস্তায় টাকা খরচ ও আল্লাহর যিকির, তাসবীহ ও নামাযের সওয়াব সাত লক্ষ গুণ বেশি হয়। এ রাস্তায় মেহনতকারীদের দুআ বনি ইসরাইলের নবীদের দুআর ন্যায় কবুল হয়। অর্থাৎ যেরকম তাঁদের দুআর দ্বারা আল্লাহপাক স্বাভাবিকের বিপরীত আপন কুদরত দ্বারা তাঁদেরকে কামিয়াব ও সফল করে বাতিলকে ধ্বংস ও মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। তেমনি এ মেহনতকারীদের দুআর বরকতে আল্লাহপাক স্বাভাবিকের বিপরীত নিজের কুদরত প্রকাশ করবেন। যদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেহনত করা হয় তাহলে সারা দুনিয়ার মানুষের অন্তরকে এ মেহনতের প্রভাবে বদলে দেবেন। দ্বীনের অন্যান্য আমলের ন্যায় আমরা দাওয়াতের এ মেহনতও করতে চাই না। তাই এ মেহনতের জন্য অন্যকে উৎসাহ দিতে হবে এবং এর গুরুত্ব ও মর্যাদা বলতে হবে। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলি শুনাতে হবে। নিজেকে কোরবানি, হিজরত ও নুসরতের কাজে লাগাতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম সকল অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছেন। বিবাহের সময়, বাচ্চা জন্মের সময়, মৃত্যুর সময়, গরমে, ঠাণ্ডায়, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, অভাব অনটন, সুস্থ-অসুস্থ, বার্ধক্য ও যৌবনে সর্ববস্থায়। এর সাথে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দুআ করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে এ মহান কাজের জন্য কবুল করে নাও।

মসজিদকেন্দ্রিক কাজ

এসব কাজের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে—সে যে কেনো বিভাগের হোক না কেন—চারমাস বা তিন চিল্লা দিতে বলা হয়। নিজের কাজ-কর্ম, সাজ-সরঞ্জাম, ঘর-বাড়ি ছেড়ে ওইসব কাজের দাওয়াত দিতে দিতে নিজে অনুশীলন করা এবং দেশে দেশে, এলাকায় এলাকায় এবং প্রত্যেক জাতি ও গোত্রের কাছে যাওয়া। রাসূল সা. সকল উম্মতকে আপন জীবদ্দশায় মসজিদওয়ালা বানিয়েছেন। মসজিদকেন্দ্রিক বিশেষ কিছু আমল দিয়েছিলেন। এ সকল আমলের কারণে মুসলমানদের চলাফেরা ও জীবনে বিশেষত্ব ছিল। মসজিদে আল্লাহর বড়ত্ব, মহিমা ও আখেরাতের আলোচনা হত। আমলের দ্বারা যিন্দেগি বনে এমন কথা হত। আমল ঠিক করার জন্য তালীম ও শিক্ষা দেওয়া হত। ঈমান ও নেক আমলের দাওয়াত দেওয়ার জন্য দেশে দেশে ও এলাকায় এলাকায় যাওয়ার জন্য তাশকীল মসজিদেই

হত। আল্লাহর যিকিরের মজলিস মসজিদেই হত। মসজিদেই তো সাহায্য সহযোগিতা, সহমর্মিমতা ও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার আমল হত। ছোট-বড়, ধনী-গরিব, কৃষক, ব্যবসায়ী, মজদুর, মালিক সবাই মসজিদে এসে যিন্দেগি চালানো শিখত। আর বাইরে গিয়ে নিজ নিজ কাজে মসজিদের শিক্ষার উপর চলত। আজ আমরা ধোঁকায় পড়ে গেছি। আমাদের টাকা-পয়সায় মসজিদ চলে। বর্তমানে মসজিদ আমল থেকে খালি আর আসবাবে ভরপুর। রাসূল সা. মসজিদকে টাকাওয়ালাদের নিয়ন্ত্রণে ছাড়েন নি। রাসূল সা. এর মসজিদে না ছিল বাতি, না ছিল পানি। আর না ছিল গোসলখানা।

মোটকথা, খরচের কোনো খাতই ছিল না। মসজিদে এসে আল্লাহর পথের দায়ী হত; ছাত্র শিক্ষক হতেন; যিকিরকারী হত; দ্বীনের অনুসারী হত; মুত্তাকি পরহেযগার ও দুনিয়া-বিমুখ হত; সচ্চরিত্রবান হত। ফলে বাইরে গিয়ে সঠিকভাবে যিন্দেগি যাপন করত। মসজিদ টাকাওয়ালাদেরকে চালাত। চারমাস প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে সকল মানুষকে মসজিদে আনার চেষ্টা করবে। মসজিদওয়ালা আমল শিখে অন্যদেরকে এ মেহনত শেখার জন্য তিন চিল্লায় বের হতে উৎসাহ দেবে।

মাকামি গাশত ও ইজতেমা

চিল্লা শেষে বাড়িতে এসে নিজের মহল্লায় এসব আমলকে যিন্দা করবে। সপ্তাহে দুইবার মহল্লার মানুষকে গাশতের মাধ্যমে জমা করে এসব কাজের প্রতি মনোযোগী করবে এবং এর অনুশীলনের লক্ষ্যে প্রত্যেক ঘর থেকে একজন করে তিন চিল্লার জন্য বের করবে। এক গাশত নিজের মহল্লায় আর দ্বিতীয় গাশত অন্য মহল্লায় করবে। প্রত্যেক মসজিদের মাকামি জামাত বানাবে। প্রত্যেক মহল্লার সাথীরা প্রতিদিন ফাযাইলে আমলের তালীম করবে।

প্রতি মাসে তিনদিনের জামাত

নিজের শহর বা মহল্লার কাছের গ্রামে কাজের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেক মসজিদ থেকে তিনদিনের জামাত পাঁচ মাইল দূর এলাকায় যাবে। প্রত্যেক সাথী পাবন্দির সাথে মাসে তিনদিন লাগাবে। তাহলে الحسنة بعشر امثالها 'সওয়াব একে দশগুণ পাওয়া যায়' হিসাবে তিনদিনের দ্বারা ত্রিশদিনের সওয়াব পাবে। সারা বৎসর মাসে তিনদিন করে লাগাবে। তখন সারা বৎসরই আল্লাহর রাস্তায় বলে গণ্য হবে। এরই সাথে দেশের ভিতরের তাকাযা ও চাহিদা পূর্ণ হতে থাকবে এবং নিজের মশক ও অনুশীলন চলতে থাকবে।

এক চিল্লা ও তিন চিল্লা লাগানো এবং এর দাওয়াত দেওয়া

প্রতি বৎসর ইহতেমামের সাথে চিল্লা লাগাবে। জীবনে অন্তত তিন চিল্লা, বৎসরে এক চিল্লা, মাসে তিনদিন, সপ্তাহে দুই গাশত, দৈনিক তালীম, তাসবীহ ও তেলাওয়াত। এটাই হচ্ছে সর্বনিম্ন নেসাব যদ্বারা আমাদের যিন্দেগি বনবে। আমরা যদি চাই ইজতেমায়িভাবে দুনিয়ার সারা মানুষের যিন্দেগি সহীহ হয়ে যাক এবং

বাতিল নিপাত যাক, তাহলে আমাদেরকে এ নেসাবের চেয়েও আরো আগে বাড়তে হবে। আমাদের সময় ও মালের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় লাগাতে হবে। আর অর্ধেক সময় ও মাল ব্যবসা বাণিজ্যে ও ঘরের কাজে। আর না হলে অন্তত এক তৃতীয়াংশ সময় ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় আর দুই তৃতীয়াংশ নিজের কাজে ব্যয় করবে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর চার মাসের তারতীব দিয়ে রাখবে।

আপনারা সারা জীবনে অন্তত তিন চিল্লা দেওয়ার ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব সহকারে দাওয়াত দেবেন। এতে মোটেই ঘাবড়াবেন না। এ ছাড়া জীবনের রুখ পাল্টাবে না। যেসব সাথী এখনো তিন চিল্লা লাগায়নি এরাও খুবই মনোযোগসহ এ নিয়তে তিন চিল্লার দাওয়াত দিতে থাকবে যে, আল্লাহপাক এর জন্য আমাকে কবুল করেন।

গাশত ও এর গুরুত্ব

গাশত এ কাজের মেরুদণ্ডের হাড়ের ন্যায়। গাশত সঠিক হলে সবকিছু কবুল হবে। দাওয়াত কবুল হবে। দুআ কবুল হবে; হেদায়ত আসবে। আর গাশত কবুল না হলে দাওয়াত কবুল হবে না। দাওয়াত কবুল না হলে দুআ কবুল হবে না। দুআ কবুল না হলে হেদায়াতও আসবে না।

গাশতের বিষয় ও দাওয়াত

গাশতের আলোচ্য বিষয় হল এই যে, আল্লাহ আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র মুহাম্মদ সা. এর তরীকায় যিন্দেগি পরিচালনার মধ্যে রেখেছেন। রাসূলের তরীকা কিভাবে আমাদের জীবনে এসে যায় এর জন্য এক মেহনতের প্রয়োজন। এ মেহনতের জন্য মহল্লাবাসীকে উৎসাহী করার জন্যই মসজিদে গাশতের জন্য জমা হওয়া। নামায শেষে এলান করে লোকদেরকে বসানো। এলান মহল্লার প্রভাবশালী কোনো লোক বা ইমাম সাহেব করলে ভালো। না হলে নিজেদের কেনো সাথী এলান করবে।

গাশতের আদাবের বয়ান

এরপর গাশতের গুরুত্ব, প্রয়োজন ও মর্যাদা আলোচনা করবে। গাশতে বের হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করবে। যারা প্রস্তুত হবে তাদেরকে ভালোভাবে গাশতের আদাব বুঝাবে যে, আল্লাহর যিকির করতে করতে চলবে; চোখ নিচের দিকে রাখবে। কারণ আমাদের সকল কাজের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে। এ দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোনো জিনিসের সাথে আমাদের কোনো বিষয়ের সম্পর্ক নেই। দুনিয়ার কোনো জিনিসের দিকে তাকাবে না। কোনো বস্তুর প্রতি খেয়াল করবে না। চোখ পড়ে গেলে এটাকে মাটির টুকরো মনে করবে। আমাদের দিল যদি দুনিয়ার জিনিসের দিকে চলে যায়, তাহলে আমরা যাদের কাছে যাচ্ছি তাদের দিল কেমন করে দুনিয়ার জিনিস থেকে আল্লাহর দিকে ফিরবে। কবরের অবস্থা যেন চোখের সামনে থাকে। এ কথা মনে করবে—এ মাটির নিচেই যেতে হবে। সবাই মিলেমিশে চলবে। একজন কথা বলবে, অন্যরা শুনবে। ওই ব্যক্তিই সফল, যে কম কথা বলে মানুষকে মসজিদে নিয়ে আসতে পারে।

ভাই! আমরা হলাম মুসলমান। আমরা কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়েছি। আমরা এ কথা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ হলেন লালন-পালনকারী, লাভ-ক্ষতির মালিক, ইযযত-সম্মান দেওয়ার মালিক। আমরা যদি আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো যিন্দেগি চালাই, তাহলে আমার আল্লাহ রাযি খুশি হয়ে আমাদের সবকিছু সমাধান করে দেবেন। আমরা সবাই কিভাবে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকায় এসে যাই—এজন্য মসজিদে কিছু দ্বীনি কথা হচ্ছে। নামায পড়ে নিলেও মসজিদে পাঠিয়ে দেবে, আর নামায না পড়লে নামায পড়াকে সাথে সাথে মসজিদে পাঠানোর মাধ্যম বানাবে।

আল্লাহর সবচেয়ে বড় হুকুম হলো নামায। নামায পড়লে আল্লাহ রুজি-রোজগারে বরকত দেবেন, গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন, দুআ কবুল করবেন। নামায পড়ার সুসংবাদ ও পুরস্কার শুনাবে, না পড়ার শাস্তির কথা বলবে— নামাযের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই মসজিদে চলো। গাশত চলাকালে আমীরের অনুসরণ করবে। ফিরে আসার সময় ইস্তেগফার করতে করতে আসবে।

গাশতের তরীকা

গাশতের আদাব আলোচনা করার পর দুআ করে গাশতে বের হবে। গাশতে দশজন লোক যাবে। মসজিদের আশেপাশের বাড়িতে গাশত করবে। আশেপাশে বাড়ি-ঘর না থাকলে বাজারে গাশত করবে। গাশতে যেন এমন লোক বেশি হয়—যারা গাশতের নিয়ম পাবন্দিসহকারে পালন করে থাকে। মসজিদে দু'তিনজন লোক রেখে যাবে। নতুন লোক বেশি তৈরি হয়ে গেলে তাদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মসজিদে কোনো আমলে লাগিয়ে দেবে। মসজিদে এক সাথী মনোযোগসহকারে আল্লাহর যিকির ও দুআয় লেগে থাকবে। একজন আগত লোকদের ইস্তেকবাল করবে। প্রয়োজন হলে ওযু করিয়ে নামায পড়াবে। আর এক সাথী আগতদেরকে নামায পর্যন্ত ঈমান ইয়াকিনের কথা বলে মশগুল রাখবে। নিজের যিন্দেগির মাকসাদ ও উদ্দেশ্য বুঝাতে থাকবে। গাশত পৌনে এক ঘণ্টা করবে। নামাযের পাঁচ-সাত মিনিট পূর্বে গাশত শেষ করবে।

ইজতেমায়ি দাওয়াত

যে সাথীর ব্যাপারে পরামর্শ হবে তিনি দাওয়াত দেবেন। একথা বুঝাবেন যে, মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হলে দুনিয়া ও আখিরাতে কী ফায়দা হবে? আর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক না থাকলে দুনিয়া-আখিরাতে কী ক্ষতি হবে? এ বইয়ের শুরুতে যেভাবে 'ছয় নম্বরের' আলোচনা করা হয়েছে এভাবে প্রত্যেক নম্বরের উদ্দেশ্য, এর ফায়দা ও কীমত এবং হাসিল করার তরীকা ও পদ্ধতি বর্ণনা করবে। বয়ান যেন সহজ সরল হয়। এর দ্বারা ইনশাআল্লাহ এ কাজ সকলের বুঝে এসে যাবে। এর প্রয়োজনও অনুভব করবে এবং এ কথা বুঝে নেবে যে, আমরা এটা শিখতে পারব। দাওয়াতের সময় আমাদের সব সাথী যেন জমে বসে থাকে। মনোযোগী হয়ে প্রয়োজন মনে করে

কথা শুনতে থাকবে আর মনে মনে একথা বলবে যে, এখানে যা কিছু বলা হচ্ছে—তা সঠিক।

এরকম করলে অন্তরে ঈমানের ঝলক অনুভব করবে। সাথে সাথে নিজের মধ্যে আমলের জযবা পয়দা হবে। তিন চিল্লার জন্য জোরালোভাবে কথা বলবে। প্রথমে নগদ নগদ নাম লেখাবে। এরপর চিল্লার জন্য সময় লেখাবে। এরপর যে যে সময়ের জন্য তৈরি হয়—তা কবুল করে নেবে।

মুতালাবা ও তাশকীল

মুতালাবা ও তাশকীলের সময়ের মেহনত দ্বারাই সারা দাওয়াতের মগজ বনে। তাশকীলের সময় যদি জমে জোরালোভাবে মেহনত করা না হয় তাহলে কাজের অনেক কথা থেকে যাবে। ফলে কোরবানি বাস্তব রূপ লাভ করবে না। ফলে কাজের জান ও মূল বিষয়ই হাতছাড়া হয়ে যাবে। দাওয়াত দেনেওয়ালাই তাশকীল করবে। একজন দাঁড়িয়ে নাম লিখবে। নাম লেখক যেন নিজে বয়ান দেওয়া শুরু না করে। তবে উৎসাহমূলক দু'একটি কথা বলতে পারবে। এরপর পরস্পরে একজন অপরজনকে উৎসাহ দিতে বলবে। সাথীরা নিজের কাছে বসা লোকটিকে ফিকির ও হেকমতের সাথে তৈরি করবে। যাদের অসুবিধা বা সমস্যা রয়েছে তাদেরকে উৎসাহ ও দিলজুয়ির মাধ্যমে সমাধান দেবে। নবী ও সাহাবীদের কোরবানি ও আত্মত্যাগের ঘটনাবলির প্রতি ইশারা করবে। এরপর উদ্বুদ্ধ করবে। সর্বশেষ মাকামি জামাত তৈরি করে তাদেরকে সপ্তাহে দুই গাশত, রোযানা তালীম, তাসবীহ ও মাসিক তিনদিন ইত্যাদির নযম করে দেবে।

দাওয়াতের তরীকা

দাওয়াতে আম্বিয়া ও সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহপাক ইমদাদ ও নুসরত এবং যে সাহায্য করেছেন তা বয়ান করবে। তবে আমাদের সাথে যে সাহায্য বা নুসরত করেছেন তা বলবে না। দাওয়াতে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করবে না। উম্মতের মধ্যে ঈমানি, আমলি ও আখলাকি যেসব দুর্বলতা এসেছে—এগুলো আলোচনা না করাই ভালো; বরং যে উত্তমগুণ সৃষ্টি হওয়া চাই এগুলোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করবে।

তালীম

তালীমে ধ্যান ও খেয়াল, সম্মান ও আযমত, মহব্বত ও আদবসহ মনোযোগ দিয়ে বসার চেষ্টা করবে। কোনো কিছুতে হেলান দেবে না। ওযুসহ বসার চেষ্টা করবে। তালীম চলাকালে কোনো ওজরের বাহানায় ওঠবে না; কথা বলবে না। এভাবে বসতে পারলে ফেরেশতারা এমন মজলিসকে ঢেকে নেবে। মহল্লাবাসীর মধ্যে তা পালনের যোগ্যতা পয়দা হবে। আযমত ও সম্মানসহ বসার চেষ্টা করলে হাদীসে পাকের ওই নূর অন্তরে আসবে—যার মাধ্যমে আমলের হেদায়াত মেলে। তালীমে বসার সাথে সাথে এর উদ্দেশ্য ও আদাবের প্রতি মনোযোগী করবে।

উদ্দেশ্য হল, আমাদের মধ্যে যেন দ্বীনের তলব পয়দা হয়ে যায়। ফাযাইলে কুরআন মজীদ পড়ে কিছু সময় কুরআন শরীফের ওইসব সূরার মশক করবে যেগুলো সাধারণত নামাযে পড়া হয়। আততাহিয়্যাতু, দুআয়ে কুনুত ইত্যাদির মুযাকারা ও সহীহ শুদ্ধ করা ইজতেমায়ি তালীমে করবে না। একা একা শেখা- শেখানোতো এগুলো সহীহ করবে। আল্লাহপাক তাওফিক দিলে প্রতি কিতাব থেকে তিন চার পৃষ্ঠা করে পড়বে। তালীমে নিজের পক্ষ থেকে কোনো বয়ান করবে না। প্রত্যেক হাদীস পড়ার পর এমন দু'তিন কথা বলবে যদ্দারা আমলের জযবা ও শখ পয়দা হয়। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রাহ. কর্তৃক লিখিত ফাযাইলে কুরআন মজীদ, ফাযাইলে নামায, ফাযাইলে তাবলীগ, ফাযাইলে যিকির, ফাযাইলে সাদাকাত ১ম ও ২য় খণ্ড, ফাযাইলে রামাযান, ফাযাইলে হজ্ব (রামাযান ও হজ্বের মৌসুমে) আর মাওলানা ইহতেশামুল হাসান কান্দালবি সাহেবের مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج (মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতন থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ) কেবল এ কিতাবগুলো ইজতেমায়ি তালীমে পড়বে ও শুনবে। একা একা বসেও এগুলো পড়বে। কিতাব পড়া শেষ হলে ছয় নম্বরের মুযাকারা করবে। সাথীদের দ্বারা ছয় নম্বর বলাবে। তালীম শুরু হলে দু'জন সাথীকে তালীমের গাশতের জন্য পাঠাবে। ১৫/২০ মিনিট পর ওই সাথীদ্বয় চলে আসবে তখন অন্য দু'জন সাথী যাবে। এভাবে মহল্লাবাসীকে তালীমে শরীক করার চেষ্টা চলতে থাকবে। বাইরে সময় লাগানোকালে দৈনিক সকালে ও যুহরের পরে দুই সময় দু'তিন ঘণ্টা করে তালীম করবে। আর নিজ মহল্লায় থাকাকালে প্রতিদিন ওই নিয়মে এক ঘণ্টা তালীম করবে। অথবা প্রথম প্রথম যত সময় সাথীরা জোড়ে ততো সময়।

মাশওয়ারা

কাজের তাকাযা ও চাহিদা চিন্তা করা, এগুলোর তারতীব ঠিক করা, এসব তাকাযার রুটিন তৈরি করা, আর যেসব সাথী সময় বের করবে তাঁদের তাশকীল করার জন্য, এ ছাড়া আরো যেসব কাজ থাকবে এগুলোর জন্য সাথীদেরকে মশওয়ারায় জোড়া যাবে। আল্লাহ তাআলার ধ্যান খেয়াল ও কাজের ফিকির নিয়ে দুআ করে মাশওয়ারায় বসবে। মাশওয়ারা বা পরামর্শে নিজের রায় বা মতামতের উপর চাপাচাপি বা ফয়সালা করানোর খেয়াল করবে না। এতে আল্লাহর মদদ ও সাহায্য চলে যায়। মতামত চাওয়া হলে আমানত মনে করে যে কথা মনে আসবে বলবে। নম্র ও ভদ্রভাবে মতামত পেশ করবে। কোনো সাথীর মতামতের বিরোধিতার তরীকা যেন না হয়। মনে মনে একথা চিন্তা করবে যে, আমার মতামতে আমার মনের খারাবি শামিল। অন্যের মতের উপর ফয়সালা হলে এতে খুশি হবে যে, আমার খারাবি থেকে হেফাযত হয়ে গেল। আর নিজের মতের উপর ফয়সালা হলে ভয় করে আরো বেশি বেশি দুআ করতে থাকবে। আমাদের একাজে ফায়সালা বা সিদ্ধান্ত প্রদানের ভিত্তি বেশিরভাগের মতামতের উপর নয়। আবার সকল কাজে প্রত্যেকের মতামত নেওয়াও

জরুরি নয়। তবে সবার মনোতুষ্টি প্রয়োজন। আমীর সাহেব একথা ইয়াকিন ও বিশ্বাস রাখবেন যে, এসব সাথীর ফিকির ও মিলেমিশে বসার বরকতে আল্লাহপাক সঠিক কথা খুলে দেবে। আমীর সবসময় নিজেকে মাশওয়ারার মুখাপেক্ষী মনে করবে। মতামত এমনভাবে দেবে যে, অন্যের মতামতের তাচ্ছিল্য না হয়। সাথীরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও মেযাজের হলে ফয়সালাকৃত বিষয়টির প্রতি সাথীদের উৎসাহ প্রদান করে উদ্বুদ্ধ করবে। আর সাথীরা আমীরের কথার উপর এমন উৎসাহ নিয়ে চলবে, যেন তাদের মতামতের উপরই ফয়সালা হয়েছে। এতেই সকলের ফায়দা। এতেই আসল তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণ। পরবর্তীতে বাস্তবে যদি দেখা যায় যে, সাথীদের মতামতই সঠিক ছিল তবুও কেউ দোষারোপ করবে না। না সরাসরি আর না ইশারা ইঙ্গিতে। এতে কল্যাণ ও খয়ের নিহিত বলে বিশ্বাস করবে। যারা আমীরকে দোষারোপ করে—এদের ব্যাপারে মারাত্মক সর্তকবাণী ও ধমক এসেছে।

সাপ্তাহিক ইজতেমা

যখন মহল্লাসমূহের মসজিদে সপ্তাহের দুই গাশতের মাধ্যমে প্রতি ঘর থেকে একজন করে তিন চিল্লার জন্য বের হওয়ার আওয়াজ উঠবে, তিন চিল্লার জন্য বের করার চেষ্টা চলতে থাকবে তখনই বৃহস্পতিবারের ইজতেমা সঠিকভাবে হবে এবং কাজ আগে বাড়ার পন্থা বের হবে। বৃহস্পতিবার আসরের নামাযের সময় থেকে মহল্লার সাথীরা আপন আপন জামাতের সাথে বিছানাপত্র ও খানা নিয়ে ইজতেমার জায়গায় পৌছবে। পরামর্শের মাধ্যমে বেশিরভাগ এমন সাথী দ্বারা দাওয়াত দেওয়াবে যারা মাঠে কাজ করে এবং যাদের তবিয়ত ও অন্তরে কাজের তাকাযা বদ্ধমূল। খুবই ফিকির ও ইহতেমামের সাথে তাশকীল করবে। এ সময় উসূল না হলে রাতেও মেহনত করতে থাকবে। সাথে সাথে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দুআ করবে। সকালে জামাতগুলো তাশকীল করে হেদায়ত দিয়ে রওয়ানা করবে। তিনদিনের জন্য মহল্লা থেকে তৈরি হয়ে আসা জামাতসমূহকে সাত-আট মাইল দূরত্বে পাঠানো যেতে পারে। প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে তিন চিল্লা ও এক চিল্লার জামাতসমূহের বের হওয়ার রুখ দেওয়া চাই। খোদা না করুক, বৃহস্পতিবার রাত যদি সকল তাকাযা পূর্ণ না হয় তাহলে পূর্ণ সপ্তাহ নিজেদের মহল্লায় এজন্য আবারো চেষ্টা করতে থাকবে। আর পরের বৃহস্পতিবার রাতে মহল্লা থেকে তাকাযার জন্য লোক তৈরি করে নিয়ে আসবে।

এ কাজের দুর্বলতা ও এর প্রতিকার

ভাই দোস্ত ও বুযুর্গ, একাজ খুবই নাজুক। রাসুল সা. একটি মেহনত করেছেন। আর এ মেহনতের ফলে সকল মানুষের সারা যিন্দেগির রুজি, খানাপিনা, বিবাহ-শাদি, মেলামেশা, ইবাদাত, মুআমালা, মুআশারা ইত্যাদি সবকিছুতে পরিবর্তন এসে যায়। রাসূল সা. এ কাজের কত তরীকা ও পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। আমরা এখনো একাজ করতে পারছি না। আর না এখনো আসল কাজ শুরু হয়েছে। আসল কাজ তো ওই

দিন শুরু হবে যখন ঈমান, ইয়াকিন, আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহার ধ্যান খেয়াল, আখিরাতের ফিকির, আল্লাহর ডর-ভয়, যুহদ ও তাকওয়া দ্বারা পরিপূর্ণ মানুষ রাসূল সা. এর উত্তম গুণাবলি দ্বারা সজ্জিত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জযবা ও আবেগে মাতাল হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জান দিতে নিজ আগ্রহে ফিরতে থাকবে।

হযরত উমর রাযি. বলেন, 'আল্লাহ রহম করুন হযরত খালেদ রাযি.-এর ওপর। তাঁর দিলে একমাত্র তামান্না ছিল এই যে, হক ও হকের অনুসারীরা চমকে উঠুক। আর বাতিল ও বাতিলের অনুসারীরা মিটে যাক। এ ছাড়া তাঁর আর কোনো তামান্না বা আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না।'

এখন আমাদের সামনে এ কাজের যেসব বরকত নজরে আসছে। এগুলো হচ্ছে কাজ শুরু করার পূর্বের বরকত। যেমন রাসূল সা. এর জন্মকালেই বরকত প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। অথচ আসল কাজ ও আসল বরকত চল্লিশ বৎসর পরে শুরু হয়। এখনো তো এজন্য মেহনত করা হচ্ছে যে, কাজ করনেওয়ালা লোক যেন তৈরি হয়ে যায়। আল্লাহপাক আসল কাজ ওইসব লোক দ্বারাই নেবেন এবং হেদায়ত প্রসারের ও ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম ওঁদেরকে বানাবেন, যাঁদের যিন্দেগি আপন দাওয়াত অনুযায়ী বদলাবে। আর যাদের যিন্দেগিতে পরিবর্তন আসবে না, বদলাবে না আল্লাহ ওদের দ্বারা আপন দ্বীনের কাজ নেবেন না। এটা হল নবীওয়ালা কাজ।

উসূল বা নিয়মনীতি ও সুহবত

এ কাজে প্রত্যেক নিজেকে উসূল ও নিয়মনীতি শেখার মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী মনে না করলে এবং নিয়মের উপর না চললে মারাত্মক ফিতনার আশঙ্কা থাকে। রাসূল সা. বাইরের দেশসমূহে কাজ শুরু করার ইচ্ছা করলে প্রথমে তিনদিন পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামকে তারগীব ও উৎসাহ দিতে থাকতেন। এরপর বলতেন, এখানে যেভাবে কাজ হচ্ছে হুবহু এভাবে বাইরে গিয়েও কাজ করতে হবে। এ কাজের ধরন সবখানে একই। স্থান, কাল, ভাষা, সংস্কৃতি, মৌসুম ইত্যাদির কারণে এ কাজের নিয়মনীতিতে কোনো পরিবর্তন হবে না। এ কাজের নিয়মনীতি এবং পথ ও পদ্ধতি জানার জন্য এবং এগুলোর ওপর টিকে থাকতে হলে এ পরিবেশে বারবার আসতে থাকা একান্ত জরুরি। যেখানে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রাহ. জান কুরবান করেছিলেন। এ ছাড়া ওইসব বুযুর্গদের সাথেও দেখাসাক্ষাৎ, মোলাকাত এবং মেলামেশা ও উঠাবসা করাও জরুরি, যাঁরা হযরতের সাথে একাজে সঙ্গী ছিলেন এবং ওই সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কাজে লেগে আছেন। এ ছাড়া কাজ সঠিক নিয়মনীতি ও তরীকার উপর টিকে থাকা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসম্ভব। এ কারণে সাথীদেরকে সময়ে সময়ে ওই পরিবেশে ও মারকাযে ইহতেমামের সাথে পাঠাতে থাকবে।

নকশার বিপরীত চেষ্টা

সকল নবী-রাসূল আ. নিজ নিজ যামানার পরিবেশ, শক্তি ও প্রচলিত মতাদর্শের মোকাবালায় এসে বলেছেন, এ পরিবেশ ও শক্তির সাথে কামিয়াবি ও সফলতার

মোটেই কেনো সম্পর্ক নেই। কামিয়াবি ও সফলতার সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহ তাআলার মহান সত্তার সাথে। আমল ঠিক হলে আল্লাহপাক ছোট শক্তির মাধ্যমে কামিয়াব করে দেখান। আর আমল খারাব হলে বড় থেকে বড় শক্তি ও পরিকল্পনাকে ভেঙ্গে চুরমার করে নাকাম ও বিফল করে দেখান। সফল হতে হলে আম্বিয়ায়ে কেরামের পদ্ধতিতে আমল ঠিক করো। প্রত্যেক নবী আপন সময়কালের প্রচলিত মতাদর্শের মোকাবালায় মেহনত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ সা.সহ প্রায় সকল নবী হুকুমাত, সম্পদ, কৃষি ও শিল্পের বিপরীত প্রেরিত হন। তাঁদের মেহনত এসব জাগতিক বিষয়াবলির আলোকে চলেনি। রাসূল সা. এর মেহনত-মুজাহাদাও কোরবানির আলোকে পরিচালিত হয়েছে। বাতিল আরাম আয়েশের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করলেও হক কষ্ট সহ্যের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। বাতিল রাজ্য ও মালের দ্বারা চমকিলে হক দরিদ্রতা ও নিঃস্বতার অনুশীলন ও মশকের মাধ্যমে চমকায়। যত ফিতনা রাজ্য ও সম্পদের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, এদের ধ্বংস গরিবি, দরিদ্রতা ও কষ্ট সহ্যের মাধ্যমে হবে। এখন এ কাজের দ্বারা উম্মতের মধ্যে মুজাহাদা ও কোরবানির যোগ্যতা পয়দা করা হচ্ছে। এ কাজের একটি বড় বিপদ হচ্ছে, এ কাজকে প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হলে এ কাজের জান বেরিয়ে যাবে। এ কাজের হেফাযত হল, কাজ করনেওয়ালা এ কাজের সকল সহজলভ্য মাধ্যমকেও কোরবানি করে কষ্টের তরীকাগুলো টিকিয়ে রাখবে। আর কোনোক্রমেই কষ্টকর অবস্থাগুলোকে শেষ হতে না দেওয়া। গরিব ও দরিদ্রদের মধ্যে কাজকে সম্প্রসারিত করতে হবে। পয়দল ও পায়ে হাটা জামাত চালাতে হবে। লোক এসে বলবে— আমার এ টাকাগুলো দ্বীনের কাজে খরচ করুন। তখন প্রচলিত পদ্ধতিকে কোরবানি দিতে হবে। বলতে হবে জনাব এখানে এ কাজের মাধ্যমে খরচ করার সঠিক ও পবিত্র তরীকা ও আবেগ শিক্ষা দেওয়া হয়। এরপর আপনি তালাশ করে নিজে সঠিক স্থানে খরচ করুন। এখানে খরচ করার পদ্ধতি শিখে নিন।

এ কাজের প্রচার ও ব্যাপকতার জন্য প্রচলিত মাধ্যম তথা সংবাদ, পোস্টার, লিফলেট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে হবে; বরং প্রচলিত শব্দাবলি থেকে পর্যন্ত পুরোপুরি দূরে থাকা আবশ্যক। দাওয়াতে তাবলীগের সম্পূর্ণ কাজ হচ্ছে গয়রে রাওয়াজি। রাওয়াজি বা প্রচলিত তরীকায় রাওয়াজি কাজের সহযোগিতা ও শক্তি হবে।

এ কাজের মূল হচ্ছে দাওয়াত, গাশত, তালীম ও তাশকীল ইত্যাদি। মাশওয়ারা বা পরামর্শের প্রয়োজন হলে মুনাসিব সাথীদেরকে নিয়ে আলাদাভাবে মাশওয়ারা করে নেবে। এমন যেন না হয় যে, পরামর্শকারীদের কেনো সময়ই উমূমি আমলে জোড়ার সুযোগ হয় না।

কলেজ-ভার্সিটির ছাত্রদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ

কলেজ-ভার্সিটিতে এ কাজকে মজবুত করতে হবে। আবাসিক হোস্টেলসমূহে মাকামি কাজের জামাত বানাতে হবে। এক গাশত হোস্টেলওয়ালারা আপন হোস্টেলে

করবে। আশেপাশের মহল্লার জামাতরাও হোস্টেলে গিয়ে গাশত করবে। হোস্টেলের সাথীরা দৈনিক তালীম ও মাসে তিনদিন লাগাবে।

মস্তুরাতের মধ্যে কাজের তরীকা

মস্তুরাতের মধ্যে কাজের ঝুঁকি আরো বেশি। পর্দাহীনতার সম্ভাবনা থাকলে মহিলাদের সাধারণ ইজতেমায় মোটেই আনা যাবে না। নিজ নিজ মহল্লার কোনো পর্দাকৃত বাড়িতে আশেপাশের ঘরের মহিলারা কোনো একদিন জমা হয়ে তালীম করে নেবে। এর শুরু এভাবে করবে— পুরুষ ইজতেমায় যে কথা দাওয়াত ও তালীম ইত্যাদি সম্পর্কে শুনবে এগুলো আপন ঘরওয়ালাদেরকে শুনাবে। এতে আশা করা যায় স্বল্প সময়ে পরিবর্তন শুরু হবে। এরপর মহল্লাসমূহে তালীম শুরু হওয়ার পর এমনও করা যেতে পারে যে, সারা শহরের মহিলাদের সপ্তাহে একদিন এমন কোনো জায়গায় ইজতেমা হবে যেখানে পর্দার পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। ওখানে তালীমের পর কেউ পর্দার আড়াল থেকে বয়ান করবে। মাঝে মধ্যে একদিন বা তিনদিনের জন্য আশপাশের জন্য জামাত বানানো যেতে পারে। মহিলাদরে জামাতের সাথে তাদের স্বামী থাকবে। অন্যথায় মহিলার সাথে শরয়ী মহরুম থাকতে হবে। পর্দার সাথে যাবে। পর্দা করা বাড়িতে অবস্থান করবে। আর পুরুষরা মসজিদে অবস্থান করে কাজ করবে।

শেষকথা

রাসূল সা. যেসব জায়গায় দ্বীনের মেহনত করেছেন। ওইসব স্থানের লোকদেরকে এ মেহনতে উঠানোর জন্য এবং ওইসব দেশে এ কাজের নমুনা ও হরকত যিন্দা করার মাধ্যম উমরার এ সফর হতে পারে। প্রত্যেক জায়গার পুরাতনদের সাথে মিলিত হওয়ার, এ কাজে এককেন্দ্রিকতা পয়দা হওয়ার এবং একাজের নিয়মনীতিগুলো তাঁদের সামনে বিস্তারিতভাবে আসার এটাই মোক্ষম সুযোগ।

নিয়মনীতিগুলো লিখতে গিয়ে চিঠিটি একটু লম্বা হয়ে গেল। আপনারা এর প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি শব্দকে মনোযোগসহকারে পড়ার চেষ্টা করবেন। ইনশাআল্লাহ অনেক ফায়দা হওয়ার আশা করা যায়। আপনারা ওখানকার অবস্থা প্রতি পনের দিন পরপর আমাদেরকে জানাতে থাকবেন। তাহলে আমাদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি হবে। সকল সাথীকে সালামে মাসনূন জানাবে। ওয়াসসালাম...।

— বান্দা মুহাম্মদ ইউসুফ

৬৪–৬৯

আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া জামাতসমূহের প্রতি হযরতজি মাওলানা ইউসুফ রাহ. এর

বিদায়ী হেদায়ত

আপনারা নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছেন। দূরে কাছে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যাবেন। যদি আপনাদের মধ্যে আলো ও নূর থাকে তাহলে আলোর প্রচারক হবেন। আর যদি আপনাদের মধ্যে অন্ধকার থাকে তাহলে তো তখন ওই অন্ধকারই ছড়াবে। এ কারণে প্রত্যেকের এ চেষ্টা করা উচিত যে, নিজের মধ্যে যেন আলো হয়। নিজে আলোকময় হওয়ার চেষ্টা করবেন। কোনো মানুষের সত্তায় আলো থাকে না। নূরানি আমল দ্বারা মানুষের মধ্যে নূর ও আলো পয়দা হয়। এ কারণে আপনাদের উচিত নূরানি আমল করা। যাতে নিজের মধ্যে নূর ও আলো আসে এবং নিজের দ্বারা অন্যের মধ্যে আলো ছড়ায়। নিজেকে অন্ধকারওয়ালা আমল থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। যাতে নিজে অন্ধকার ছড়ানোর মাধ্যম না হই।...............

নূরানি আমল নূর পয়দা করার মাধ্যম তখনই হবে—যখন এ সকল আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে বদলা পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হবে।..............

আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া জামাতসমূহের প্রতি

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ রাহ. এর বিদায়ী হেদায়ত

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ রাহ. প্রত্যেক ইজতেমার শেষে একটি জামে ও ব্যাপক হেদায়তি বয়ান বিদায়ী জামাতসমূহের সামনে পেশ করতেন। দীর্ঘ ও বিস্তারিত এ হেদায়তি বয়ান এমনভাবে করতেন যে, মনে হত এটাই তাঁর জীবনের শেষ তাকরির ও বয়ান। এর পর দুআ করতেন। মাওলানা হেদায়তে ভরপুর এমন তাকরির অনেক ইজতেমায় করেছেন। যেগুলো জমা করা কঠিন। এগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় একই। অনুমান ও ধারণা পাওয়ার জন্যে এখানে একটি ইজতেমার শেষে যে হেদায়তি বয়ান করেছিলেন তা পেশ করা হচ্ছে।

এ ইজতেমাটি কলকাতার 'মাগরাহাট' এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শেষদিন জামাতসমূহের তাশকীল শেষে যখন বিদায়ের সময় হয়, তখন মাওলানা অভ্যাসানুযায়ী আখেরি এ বিদায়ী তাকরির দেন। যা আগাগোড়া সম্পূর্ণ হেদায়তে ভরপুর ছিল। মাওলানা মনযুর নোমানি রাহ. এগুলো সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে পরে তারতীব দেন। মাওলানা মনযুর নোমানি রাহ. বলেন, 'এতে যাকিছু রয়েছে—এর বিষয়বস্তু মাওলানার বলা। তবে শব্দের ব্যাপারে এ দাবি করা যাবে না'। লেখক এ তাকরিরের উপ-শিরোনাম স্থাপন করেছেন। যাতে তাকরিরটি সহজে বুঝা যায় এবং অন্তরে স্থান করে নিতে ও বদ্ধমূল হতে কোনো অসুবিধা না হয়।

খুতবায়ে মাসনুনা পাঠের পর মাওলানা বলেন—

চন্দ্র আলোকময়। এতে আলো রয়েছে। সে নিজে আলোসহ চক্কর লাগায় তখন দুনিয়ায় আলো ছড়িয়ে পড়ে। চন্দ্র আলোময় না হয়ে যদি অন্ধকারচ্ছ হত। এতে যদি আলোর বদলে অন্ধকার হত। তাহলে তো সে দুনিয়াতে অন্ধকারই ছড়ানোর মাধ্যম হত।

আপনারা নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছেন। দূরে কাছে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যাবেন। যদি আপনাদের মধ্যে আলো ও নূর থাকে তাহলে আলোর প্রচারক হবেন। আর যদি আপনাদের মধ্যে অন্ধকার থাকে তাহলে তো তখন ওই অন্ধকারই ছড়াবে। এ কারণে প্রত্যেকের এ চেষ্টা করা উচিত যে, নিজের মধ্যে যেন আলো হয়। নিজে আলোকময় হওয়ার চেষ্টা করবেন। কোনো মানুষের সত্তায় আলো থাকে না। নূরানি আমল দ্বারা মানুষের মধ্যে নূর ও আলো পয়দা হয়। এ কারণে আপনাদের উচিত নূরানি আমল করা। যাতে নিজের মধ্যে নূর ও আলো আসে এবং নিজের দ্বারা অন্যের মধ্যে আলো ছড়ায়। নিজেকে অন্ধকারওয়ালা আমল থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। যাতে নিজে অন্ধকার ছড়ানোর মাধ্যম না হই।

নূরওয়ালা আমল

নূরওয়ালা আমল হচ্ছে ওই মুহাম্মদি আমল—যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়। এসব আমল বেশি বেশি করে ধারাবাহিকভাবে এমন মনোযোগসহকারে করবে যে, নিজে এগুলোর নূরানি রঙে রঙিন হয়ে যেতে পারো। আর ওই নূরানি আমলগুলো হলো এই—

১. ইখলাসের সাথে ঈমান ও ইয়াকিন হাসিল করার দাওয়াত দেওয়া; যা আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. এর বিশেষ মিরাস। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর মাখলুকের সাথে সর্বাধিক বড় ও মহান কল্যাণ।

২. নামায ও অন্যান্য সকল ইবাদত। যিকির, তেলাওয়াত, দুআ, ইস্তেগফার সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. ইলমের প্রতি মনোযোগ দেওয়া । বিশেষ করে ওই ইলম; যা দ্বারা মানুষের আমল ও অন্যান্য কাজের ফলাফল আখিরাতে প্রকাশ পাবে এর বর্ণনা থাকে। অর্থাৎ তারগীব ও তারহীব বা উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন।

৪. উত্তম চরিত্র। যা ছিল মুহাম্মদ সা. এর আখলাক ও চরিত্র। যেগুলো তিনি নিজে শিক্ষা দিয়েছেন। যার সারাংশ হচ্ছে—আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর মাখলুকের খেদমত করা ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

এগুলো হচ্ছে ওই নূরানি আমল যেগুলো লাগাতার বেশি বেশি করে করলে নূর পয়দা হয় এবং যিন্দেগি নূরানি ও আলোকিত হয়। প্রত্যেককে ওইসব আমলে মশগুল থেকে চলাফেরা করতে হবে।

দুই দুশমন

মনে রাখবে, তুমি কেবল তোমার ঘর, তোমার পরিবার-পরিজন এবং বিশেষ পরিবেশ ছেড়ে যাচ্ছ। নফস ও শয়তানকে ছেড়ে যাচ্ছ না। এই দুই দুশমন প্রতি কদমে দিনরাতের প্রতি মুহূর্তে তোমার সাথে রয়েছে। তোমার খারাপ অভ্যাসমূহও তোমার সাথে থাকবে। এরা তোমাকে এমন কাজের দিকে টানবে যা দ্বারা তোমার মাঝে অন্ধকার ও যুলমত আসে। এগুলোর দ্বারা তুমি আল্লাহর দরবার থেকে দূরে থাকবে; তাঁর সন্তুষ্টি থেকে মাহরূম ও বঞ্চিত হবে।

দুশমন থেকে হেফাযতের তরীকা ও পদ্ধতি

তুমি ওইসকল দুশমনের অনিষ্ট থেকে কেবল এভাবে বাঁচতে পারবে যে, ঘুমানোর ছয় সাত ঘণ্টা ব্যতীত রাত-দিনের অন্য সময় নিজেকে শুধু নূরানি আমলসমূহে লাগিয়ে রাখবে। অথবা তুমি ঈমান বা ঈমানি আমলের দাওয়াত দিতে থাকবে। অথবা নামায, যিকির ও তেলাওয়াত ইত্যাদি কোনো না কোনো আমলে ব্যস্ত থাকবে। অথবা শিক্ষা করা ও শিক্ষাদানে লেগে থাকবে। অথবা খেদমতের কোনো কাজ করতে থাকবে। নফস ও শয়তান থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় এটাই যে, তোমার সময় যেন এসব কাজ থেকে ফারিগ না হয়। কারণ খালি ঘরেই শয়তান আস্তানা গাড়ে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি

তবে এসব আমল নূর হাসিল করার মাধ্যম তখনই হবে যখন এসব আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হবে। আল্লাহ না করুক, এসব আমল যদি সঠিক নিয়তে করা না হয়, তাহলে এগুলোই জাহান্নামে যাওয়ার মাধ্যম ও কারণ হবে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর প্রসিদ্ধ হাদীস—রাসুল সা. বলেন, কিয়ামতদিবসে সর্বপ্রথম তিনজন ব্যক্তির ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা হবে এবং সর্বপ্রথম এদেরকেই জাহান্নামে উল্টোমুখী করে ফেলা হবে। এদের একজন হল ওই আলিমে দ্বীন ও আলিমে কুরআন, যে সারাজীবন কুরআন শেখানোতে ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় ওই দানশীল সম্পদশালী ব্যক্তি, যাকে আল্লাহপাক দুনিয়াতে অনেক সম্পদ দিয়েছিলেন। যা থেকে সে আল্লাহর রাস্তায় দুই হাতে ব্যয় করত। তৃতীয় আল্লাহর রাস্তায় শহীদ ব্যক্তি, যে জিহাদের ময়দানে শত্রুর আঘাতে শহীদ হয়েছে। কিন্তু এ তিনজন ওইসকল আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে নি; বরং দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ ও ইযযত-সম্মান হাসিলের লক্ষ্যে করেছিলে। রাসূল সা. বলেন, কিয়ামতদিবসে যখন এ তিন প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে, তখন আল্লাহ বলবেন, 'আমি অন্তর ও নিয়তের খবর জানি। তোমরা এসব উত্তম নূরানি আমল আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করনি; বরং দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে করেছিলে। আর এটা তো তোমরা দুনিয়ায় পেয়ে গেছ। এবার তোমাদের জন্য এখানে কোনো কিছু নেই। এরপর তাদেরকে তাদের ওই আমলের কারণেই টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে ফেলা হবে'। হাদীসে এ-ও এসেছে যে, এরাই হবে জাহান্নামিদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাদের ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা করা হবে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

চিন্তা করো! এ হাদীস শরীরে কতটুকু কম্পন সৃষ্টিকারী। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এ হাদীস বর্ণনাকালে কখনো কখনো ভয়ে এমন চিৎকার করতেন যে, বেহুঁশ হয়ে যেতেন।

একবার জনৈক তাবেয়ী এ হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযি. থেকে শুনে হযরত মুয়াবিয়া রাযি. এর সামনে বর্ণনা করলে মুয়াবিয়া রাযি. এত বেশি কাঁদতে থাকেন যে, লোকেরা তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কা করয়ীল। অনেক সময় পর তাঁর অবস্থা স্বাভাবিক হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহপাক কুরআন শরীফে কতই না সঠিক কথা বলেছেন এবং রাসূল সা. কতই না সঠিকভাবে তা পৌঁছিয়েছেন যে,

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

"যে ব্যক্তি আপন আমলের পরিবর্তে দুনিয়া ও দুনিয়ার সাজ-সজ্জা চাইবে তাকে তার আমলের পরিপূর্ণ বদলা দুনিয়াতেই আমি দিয়ে দেব এবং এতে কোনো ধরনের

ত্রুটি করব না। তবে এদের জন্য আখেরাতে জাহান্নামের আগুন ছাড়া অন্য কোনো কিছুই থাকবে না। আর তারা যে আমল করেছে তা ধ্বংস ও বেকার হয়ে যাবে। এর দ্বারা তাদের কোনো ফায়দা হবে না।"

মোটকথা, নূরানি আমল নূর পয়দা করার মাধ্যম তখনই হবে—যখন এ সকল আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে বদলা পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হবে। তাই একদিকে নিজের পূরা সময় এ সকল আমলে কাটাবে। সেই সাথে এ কথার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে যে, নিয়ত যেন সহীহ-শুদ্ধ থাকে। কারণ শয়তান যখন কোনো বান্দাকে নেক আমল থেকে বিরত রাখতে পারে না, তখন আমলকারীর নিয়ত নষ্ট করার চেষ্টা করে। নেক আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করলে এর সাথে আল্লাহর কোনো সর্ম্পক থাকে না। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজ নয় এমন আমলও আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে করলে এর সাথেও আল্লাহর সম্পর্ক থাকে না এবং তা আল্লার সন্তুষ্টির মাধ্যমও হয় না।

তাই দু'টি চেষ্টা করতে হবে—

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকা। সবসময় এমন কাজে লেগে থাকবে যে, এগুলোর রং এসে যায়।

২. নিয়ত সহীহ ও সঠিক রাখার ইহতেমাম করবে। এর অর্থ হল—প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়। সকল কামিয়াবি ও সফলতা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে রয়েছে সকল নাকামি ও বিফলতা।

আসল কাজ তো মাত্র চারটি

আমি অবশ্য বলে দিয়েছি যে, আল্লাহর রাস্তায় থাকাকালীন নিজেকে চারটি কাজে সীমাবদ্ধ রাখবে।

১. প্রথম কাজ হল ঈমান ও ইয়াকিনের। ঈমানওয়ালা আমলের দাওয়াত দেওয়া। আর এ দাওয়াতের জন্য উমূমি ও খুসূসি অর্থাৎ সাধারণ ও বিশেষ গাশত করতে হবে। এর আদব ও নিয়মনীতি গাশতের জন্য বের হওয়ার সময় বলতে হবে। এগুলো ধ্যান-খেয়াল ও মনোযোগসহকারে শুনবে। এর পর দাওয়াতের জন্য বাজারের গলিতে গেলে শয়তান তোমাকে ওখানকার জাগতিক জিনিসের প্রতি মনোযোগী করবে। তাই সর্বপ্রথতাকে এ থেকে মহরূম ও বঞ্চিত রাখেন।

২. দাওয়াতের পর দ্বিতীয় কাজ হল তালীম। তালীমে বসার সময় আদবসহ বসবে। মন যেন রাসূল সা. কর্তৃক নিয়ে আসা ইলমের আযমত ও সম্মান দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। মাসায়াইলের আলোচনা করবে। রাসূল সা. এর শিক্ষা দেওয়া দুআসমূহ মুখস্থ করবে।

৩, ৪. দাওয়াত ও তালীমের পর যে সময় অবসর থাকবে—কোনো জরুরি কাজ থাকবে না, তখন নফল নামায পড়বে অথবা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে অথবা যিকির ও তাসবীহে লেগে যাবে নতুবা আল্লাহর কোনো বান্দার খেদমত করবে।

যেভাবে নামাযরত ব্যক্তি হয়তো দাঁড়ানো থাকে; কিংবা রুকু সেজদা বা বসা অবস্থায় থাকে। তেমনি আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার পর হয়ত দাওয়াতে লেগে থাকবে অথবা শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, যিকির-আযকার, ইবাদত-বন্দেগি করবে। নতুবা আল্লাহর কোনো মাখলুকের খেদমতে লেগে থাকবে। এ চারটি কাজ সবসময় মাকসাদ ও উদ্দেশ্য হিসেবে করবে এবং এগুলো এতবেশি করবে যে, অভ্যাস ও মেযাজ যেন বনে যায়।

এগুলো ইজতেমায়ি ও একা উভয়ভাবে করবে। ইজতেমায়ি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যা জামাতের নিয়মের মধ্যে থেকে করা হয়। যেমন উমূমি গাশত, খুসূসি গাশত, জামাতের তালীমের সময় তালীমে শরীক হওয়া, জামাতে ফরয নামাযসমূহ ও আগের পরের সুন্নাত নফল পড়বে। ইজতেমায়ি কাজ বণ্টন হিসেবে খানা ইত্যাদির ইনতেজামে আগে আগে থাকবে। এগুলো হল ইজতেমায়ি আমল। একাকী দাওয়াত, একাকী তালীম, একাকী ইবাদত ও একাকী খেদমত হচ্ছে ওই যা জামাতের প্রোগ্রামের বাইরে কোনো ব্যক্তি আপন অবসর সময়ে করে থাকে। যখন ইজতেমায়ি কোনো আমল নেই। যেমন দুপুরের খানার পর আসর পর্যন্ত ইজতেমায়ি দাওয়াত বা তালীম ইত্যাদি থাকে না—তখন প্রত্যেকের অনুমতি থাকে, সে তখন আরাম করবে। এখন যদি কোনো আল্লাহর বান্দা নিজের আরাম করার সময় আরাম না করে কারো কাছে গিয়ে ঈমানের দাওয়াত দিতে থাকে বা কাউকে কোনো দুআ মুখস্থ করায়, নতুবা তার নামায শুদ্ধ করাতে থাকে বা মসজিদের এক কোণে নফলে দাঁড়িয়ে যায়; অথবা কোনো সাথীর খেদমত করতে আরম্ভ করে। তাহলে এগুলো হল ইনফেরাদি বা ব্যক্তিগত আমল।

মোটকথা, আল্লাহর রাস্তায় থাকার সময় এ চারটি কাজ আসল মাকসাদ হিসেবে করবে। মানবিক প্রয়োজন ছাড়া নিজের সকল সময় এসব কাজে ব্যয় করতে চেষ্টা করবে। তাহলে তখন যিন্দেগিতে নূর আসবে এবং ইনশাআল্লাহ এ নূর অন্য পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং প্রচার প্রসার লাভ করবে।

প্রাকৃতিক চার কাজ

পূর্বোক্ত চার কাজ ব্যতীত আরো চারটি কাজ এমন—যা বাধ্য হয়ে করতে হয়। এগুলো প্রয়োজন মতো করবে।

এ চারটি জিনিস হল এই—

১. খানাপিনা।

২. প্রশ্রাব পায়খানা।

৩. ঘুম।

৪. পরস্পরে কথাবার্তা বলা।

এগুলো বাধ্যতাজনক কাজ। এগুলোতে এমন সময় ব্যয় করবে, যতটুকু না হলে না হয়। রাতদিনে ছয় ঘণ্টা ঘুমানো যথেষ্ট।

চারটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে

চারটি কাজ এমন যেগুলো থেকে খুবই সতর্কভাবে বেঁচে থাকবে—

১. কারো কাছে কোনো কিছু চাইবে না; কারো সামনে আপন প্রয়োজনের কথাও প্রকাশ করবে না। কারণ তাও এক প্রকার সুওয়াল বা চাওয়া।

২. ইশরাফ থেকেও বেঁচে থাকবে। ইশরাফ হল এই যে, মুখ দ্বারা তো চাইলে না ঠিক তবে মনে মনে কারো পক্ষ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা। এটা মৌখিক চাওয়া নয়; অন্তরের চাওয়া।

৩. ইসরাফ বা অপব্যয় থেকে বেঁচে থাকবে। অপব্যয় সর্বাবস্থায় দোষণীয় ও ক্ষতিকর। বিশেষ করে আল্লাহর রাস্তায় থাকাকালীন অপব্যয়ের ফলাফল নিজের বেলায় খুবই খারাপ ও মারাত্মক হয়। সাথে অন্যান্য সাথীদের বেলায়ও।

৪. অনুমতি ছাড়া কোনো সাথীর কোনো জিনিস ব্যবহার করবে না। এর দ্বারা কখনো অন্যের খুবই কষ্ট হয়ে যায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা মারাত্মক হারাম। তবে মালিকের অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই।

মোটামোটিভাবে এগুলো হল জরুরি কথা। যারা আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগায় তাদের জন্য এগুলোর পাবন্দি করা জরুরি। আপনারা ২৪ ঘণ্টা এসব কাজে পাবন্দির সাথে কাটাবেন। এসব কাজ পাবন্দির সাথে করে তুমি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে চলাফেলা করতে থাকো এবং সবসময় নিজের জন্যে, উম্মতে মুসলিমার জন্যে ও সকল মানুষের জন্য আল্লাহর দরবারে হেদায়তের দুআ করতে থাকো।

ব্যস, এটাই হচ্ছে তোমার আমল, তোমার ওযীফা। তুমি এভাবে সময় কাটাতে পারলে মহা-দয়াবান আল্লাহ তোমাকে তাঁর দান থেকে মাহরূম ও বঞ্চিত করবেন না, ইনশাআল্লাহ।

৭২-৯৬

মাওলানা সাঈদ আহমদ খান রাহ. কর্তৃক লিখিত

তাবলীগী কাজের কয়েকটি মূলনীতি

এ কথা জরুরি যে, এ কাজে জুড়ে থাকার সাথে সাথে এ মেহনতের হাকিকত, এ কাজের পদ্ধতি এবং এর নিয়মনীতি ও আদবসমূহ বুঝে তা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সাথে সাথে আপন মুরব্বিদের কাছ থেকে তাহকিক ও তালাশ করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলার আয়াত ও হাদীসে রাসূলের সাথে মেলাতে থাকবে। এ কাজ শুধু বড়দের অনুসরণ হিসাবে নয়; বরং আপন অন্তর থেকে বুঝে আত্মবিশ্বাস নিয়ে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে করনেওয়ালা হও। যাতে এ কাজের হেকমত আমাদের বুঝে এসে যায় এবং নিজেরাও হেকমতসহ এ কাজ করতে পারি।...............

আমরা যখন দাওয়াতের নম্বরের আলোচনা করি, এর গুরুত্ব বর্ণনা করি, তখন দ্বীনের অন্য শাখা তালীম অর্থাৎ মাদরাসায় পড়াশোনার উপর দাওয়াতকে এত বেশি গুরুত্ব দিই যে, দাওয়াতের মুকাবালায় মাদরাসায় পড়াশোনা যেন কোনো কিছুই নয়। আবার কখনো যিকিরকারী (অর্থাৎ তাসাউফের মেহনতে মশগুল)-দের মুকাবেলায় এত জোর দিই যে, তাসাউফ কিছুই নয়। সবকিছুই যেন দাওয়াত। ....

মাওলানা সাঈদ আহমদ খান কর্তৃক লিখিত

তাবলীগী কাজের কয়েকটি মূলনীতি

মুহতারাম ও মুকাররম,
জনাব মৌলবি জমশেদ ও মৌলবি মুত্তাকীম

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বুঝে শুনে এ কাজ করতে হবে।

আপনাদের মেহনত ও চেষ্টা আল্লাহপাক কার্যকরি করুন এবং তা যেন কবুল করেন। এ কথা জরুরি যে, এ কাজে জুড়ে থাকার সাথে সাথে এ মেহনতের হাকিকত, এ কাজের পদ্ধতি এবং এর নিয়মনীতি ও আদবসমূহ বুঝে তা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সাথে সাথে আপন মুরুব্বিদের কাছ থেকে তাহকিক ও তালাশ করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলার আয়াত ও হাদীসে রাসূলের সাথে মেলাতে থাকবে। এ কাজ শুধু বড়দের অনুসরণ হিসাবে নয়; বরং আপন অন্তর থেকে বুঝে আত্মবিশ্বাস নিয়ে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে করনেওয়ালা হও। যাতে এ কাজের হেকমত আমাদের বুঝে এসে যায় এবং নিজেরাও হেকমতসহ এ কাজ করতে পারি। ফলে মুসলমানদের আম ও খাস তবকা—যারা দ্বীনের বিভিন্ন লাইনে কাজে লেগে আছেন, তাঁরা আমাদের হেকমত ও আখলাক দেখে এ কাজে মনোযোগী হবে। এ কাজের ব্যাপারে তাঁদের কোনো এশকাল যেন না থাকে। তাঁরা এ কাজে কোনো অভিযোগ করতে না পারে। সবাই যেন বুঝতে পারে যে, এ কাজই দ্বীনের সকল কাজের সমন্বয়কারী। দ্বীনের সকল শাখা এর অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ কাজ বুঝার তাওফিক দাও। এ ছাড়া প্রত্যেক সাথীর উচিত—নিজেকে কম জাননেওয়ালা মনে করে নিজেকে জানার মুখাপেক্ষী ভেবে আল্লাহ তাআলার কাছে সবসময় দুআ করতে থাকবে, 'হে আল্লাহ, আমাদেরকে এ কাজটি বুঝার তাওফিক দাও'। কারণ শয়তান আজ খুব সহজে আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, আমরা এ কাজ বুঝে গেছি। অথচ, হযরত ইলয়াস রাহ. এর বাণী হচ্ছে, 'আমি এ কাজের হাজার ভাগের একভাগও মানুষের সামনে পেশ করতে পারিনি। আর আমি যা পেশ করেছি, এর হাজার ভাগের একভাগও কেউ বুঝেনি। কেউ কেউ বলেন, হযরতজির কথায়, হাজারের স্থলে শতভাগ ছিল। হযরতজির যখন এ কথা; তাহলে আমরা কতটুকু এ কাজকে বুঝতে পারব? আমরা তো এখনো দাওয়াত দিতে শিখিনি। এ কাজের হেকমত ও মূল বিষয় সম্পর্কে এখনো অবগত হতে পরিনি। এ কারণেই তো অনেকের—বিশেষ করে কোনো দ্বীনি কাজের সাথে সম্পর্কিতদের আমাদের দাওয়াত ও বয়ানের উপর অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, আমরা দ্বীনের ওই শাখাসমূহকে ছোট মনে করি অথবা ওই কাজ সম্পাদনকারীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি। যদি আমরা

দাওয়াতের সহীহ তরীকায় এসে যাই, তাহলে আমরা দ্বীনের যে কোনো লাইনের মেহনতকারীকে আমাদের সহযোগী, খয়েরখাহ ও কল্যাণকামী মনে করে তাঁদের কাছে যেতাম এবং তাঁরাও আমাদের কাছে আসত। যেমন মনে করো— আমরা যখন দাওয়াতের নম্বরের আলোচনা করি; এর গুরুত্ব বর্ণনা করি, তখন দ্বীনের অন্য শাখা তালীম অর্থাৎ মাদরাসায় পড়াশোনার উপর দাওয়াতকে এত বেশি গুরুত্ব দিই যে, দাওয়াতের মুকাবালায় মাদরাসায় পড়াশোনা যেন কোনো কিছুই নয়। আবার কখনো যিকিরকারী (অর্থাৎ তাসাউফের মেহনতে মশগুল)-দের মুকাবালায় এত জোর দিই যে, তাসাউফ কিছুই নয়। সবকিছুই যেন দাওয়াত। যেমন কেনো কোনো ওয়াইয অন্য নবীদের মুকাবালায় রাসূল সা.এর এতবেশি ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেন—যার দরুন অন্য নবীদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। ওয়াইযদের এরূপ বয়ান দ্বীনের জন্য যেমন মারাত্মক ক্ষতিকর, তেমনি আমাদের বয়ানের পদ্ধতিও অনেক সময় ক্ষতিকর হয়ে যায়।

দাওয়াতের বয়ান কী রকম হওয়া চাই!

বয়ান এমন হওয়া উচিত যে, প্রথমে ইলমের ফযীলত খুব বেশি করে আলোচনা করবে। সেই সঙ্গে আলিম-উলামার মর্যাদাও বর্ণনা করবে—যা কুরআন ও হাদীসে এসেছে। এ বিষয়টি এত বেশি আলোচনা করবে যে, আমাদের অন্তরে যেন ইলম ও আলিমদের আযমত ও মহব্বত বসে যায়। এ কারণে যে, ইলম হল আল্লাহর সুন্নাত। আর আমরা যেন সব সময় নিজেদেরকে ইলম ও আলিমদের মুখাপেক্ষী মনে করি।

এরপর বলবে, এ ইলম উম্মতের প্রত্যেক লোকের মধ্যে প্রয়োজন ও জরুরত পরিমাণ কিভাবে এসে যায়। এর জন্যই এ মেহনত। ইলমের সাথে যদি এ মেহনত করা যায়, তাহলে উম্মতের কোনো লোক এমন মূর্খ থাকবে না যে, সে জরুরত পরিমাণ ইলম শেখে নি—সে একথা বলতে পারবে না যে, আমার কাছে জরুরত পরিমাণ ইলম পৌছায় নি। পুরুষ মহিলা সবার ইলমের প্রয়োজন। সবাই ইলমের মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দাওয়াতের মেহনতে আমরা উলামায়ে কেরামের বেশি মুখাপেক্ষী।

তেমনি যিকরুল্লাহ ও যিকিরকারিদের গুরুত্ব খুবই ভালো করে আলোচনা করবে—যা কুরআন হাদীসে এসেছে। এ বিষয়টি এত বেশি আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে আলোচনা করবে; যাতে আমাদের অন্তর যিকির ও যিকিরকারীদের মর্যাদা ও সম্মানে ভরে যায়। আমরা নিজেরা যেন এর দ্বারা প্রভাবিত হই। এর পর বলবে, উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি; পুরুষ হোক বা মহিলা—সবাই যিকিরের মুখাপেক্ষী। তাই উম্মতের মধ্যে যিকিরকে ছড়িয়ে দিতে হলে আমরাও যিকিরকারীদের মুখাপেক্ষী।

দ্বীনের প্রত্যেকটি শাখা একটি অপরটির সহায়ক। আমরা প্রত্যেক নম্বরের আলোচনা এমনভাবে করব, যাতে এক নম্বর আরেক নম্বরের বিরোধী না হয়ে যায়;

বরং এমনভাবে আলোচনা করবে যাতে এক নম্বর অন্য নম্বরের সহযোগী বুঝা যায়। কারণ দ্বীনের প্রত্যেক শাখার উপমা হচ্ছে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়। যেমন চোখ দেখার কাজ করে, মুখ-জিহ্বা বলার কাজ, হাত ধরার কাজ, পা চলার কাজ, কান শোনার কাজ এবং মাথা চিন্তা-ফিকিরের কাজ করে। এসকল কাজ মানুষের জন্য জরুরি। এগুলোর যে কোনো একটি নষ্ট হয়ে গেলে বা এগুলোতে সামান্য দুর্বলতা দেখা দিলে শরীরের কষ্ট হয়। অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা ফায়দা হাসিল হতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই একজন মানুষের জন্য সবকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জরুরি। প্রত্যেকটি অঙ্গ পরস্পরের সহায়ক। একটি আরেকটির সহযোগী ও সাহায্যকারী, একটি আরেকটির মুকাবিল বা বিরোধী নয়।

তেমনি আল্লাহর যিকির, ইলম, ইবাদত, খেদমত, মুআমালা বা পারস্পরিক লেনদেন এবং বিচার ও ফয়সালা ইত্যাদি প্রত্যেকটি একটি অপরটির সহায়ক। মুকাবিল বা বিরোধী নয়। একটি অপরটির সহায়ক হলেই তখন পরিপূর্ণ দ্বীন হবে। আর দাওয়াত তো দ্বীনের এসকল শাখাকে দুনিয়াতে প্রচার-প্রসার ও ব্যাপক করার মাধ্যম।

উদ্দেশ্য ও মাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে

দ্বীনের কাজে কোনটি মূল লক্ষ্য, আর কোনটি মাধ্যম—তা জানতে হলে মেহনত করতে হবে। যেমন আল্লাহর যিকির, ইলম, ইবাদত ও শরীয়তের হুকুম-আহকাম ইত্যাদির মধ্যে কোনটি মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য হল—আল্লাহর সন্তুষ্টি। তবে এসব লাইনে মেহনত করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। তাই বলা যায় যে, দ্বীনের বিভিন্ন বিভাগের মেহনত করা হল মূল লক্ষ্য (আল্লাহর সন্তুষ্টি) হাসিলের মাধ্যম। আর এসব বিষয় অর্জনের মাধ্যম হল দাওয়াত। দাওয়াতের মাধ্যমেই এসব বিষয় তথা দ্বীনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা অস্তিত্ব লাভ করে। আর যখন দ্বীনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সঠিকভাবে সুবিন্যস্ত আকারে হাকিকতের ওপর অস্তিত্ব লাভ করবে তখনই আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টি—যা মূল লক্ষ্য, তা অর্জিত হবে।

সবকিছুতে দাওয়াতের প্রভাব পড়ে। যদি দাওয়াতে দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকে তাহলে এর প্রভাব দ্বীনের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় পড়বে। আর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে এর প্রভাব মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যেও বিস্তৃত হবে। অর্থাৎ দুর্বল বা ত্রুটিযুক্তভাবে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় চলনেওয়ালা আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না।

এ বিষয়টিকে একটি উপমা দ্বারা বুঝা যাক। মনে করো দুনিয়া একটি ফল। ফলের জন্য গাছ। আর গাছের জন্য জমিন। মূল লক্ষ্য কিন্তু গাছও নয়, জমিনও নয়— বরং ফল। তবে ফলের মাধ্যম হল গাছ। কারণ গাছ ছাড়া ফল অস্তিত্ব লাভ করে না। যদিও আল্লাহপাক তা করতে পারেন তবে মানুষকে দুনিয়াতে আসবাবের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। আর গাছ জমিন ব্যতীত পাওয়া যায় না। এখন যদি জমিনে উর্বরতা কম হয়, তাহলে এর প্রভাব গাছে পড়বে। আর গাছের দুর্বলতার প্রভাবে

ফলও দুর্বল হবে। তাই সর্বদা আমাদের চোখের সামনে উদ্দেশ্যই হতে হবে আসল টার্গেট। এজন্য সবসময় আল্লাহর পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির আগ্রহ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। আর এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমেই তিনি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহর যিকির ও ইলম হচ্ছে আল্লাহর আদেশসমূহের আযমত ও গুরুত্ব সৃষ্টি করার জন্য। আর আদেশদাতার আযমত আদেশসমূহের উর্ধ্বে থাকতে হবে অন্যথায় আদেশসমূহকে পালন করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। বাদশাহর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভালবাসা প্রজাদের অন্তরে যে পরিমাণ থাকবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ ওই পরিমাণই তারা মানবে।

দাওয়াত বড় স্পর্শকাতর বিষয়

দাওয়াত বড় নাযুক ও স্পর্শকাতর। এ কাজে নিজেকে গলদগর্ম করতে হয়। এতে নিজের মর্যাদাকে খতম করতে হয়। অন্য মুসলমানের মর্যাদা ও কদর দিলে বসাতে হয়। একেবারে সাধারণ গুনাহগার মুসলমানকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণে বড় ও সম্মানী মনে করতে হবে। তখনই আমরা তার সাথে উত্তম ও ভালো ব্যবহার করতে পারব। নিজেকে মুখাপেক্ষী মনে করেই প্রত্যেক মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। মুসলমানের যিয়ারত করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, বরকত হাসিল হয়, রহমত আসে, মহব্বত ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মুসলমানের যিয়ারতে যদি এতসব ফায়দা তাহলে ইলম ও যিকিরওয়ালা মাশায়েখদের যিয়ারত যে কত মহান ও বড়! তা কি বলে বুঝাতে হবে।

কারো দোষ-ত্রুটির দিকে তাকাবে না

দাওয়াতের কাজে একটি বিশেষ জিনিস হল এই যে, অন্য মানুষের দোষ-ত্রুটি ও ভুলের প্রতি খেয়াল করা থেকে বিরত থাকবে। যদি শয়তান কখনো ওয়াসওয়াসা দিয়েও দেয়, তাহলে সাথে সাথে তাওবা ইস্তেগফার করে নেবে এবং ওই মুসলমানের সাথে ভালো ও উত্তম ব্যবহার এবং মহব্বতের সাথে মিলে এর ক্ষতি পুষিয়ে নেবে। তিনটি কাজ দ্বারা তা করা যেতে পারে।

১. সাক্ষাতকালে তাকে সালাম দেবে।

২. সে তোমার কাছে এলে ভালো জায়গায় বসিয়ে তাকে সম্মান করবে।

৩. মাঝে মধ্যে তাকে হাদিয়া তুহফা দিবে।

তাওবা ইস্তেগফার করার সাথে সাথে এ তিনটি জিনিস খুবই ফলপ্রসূ। এ কাজে সাধারণ মানুষকে বের হওয়ার দাওয়াত অবশ্যই দেবে। তবে মনে করবে যে, যদি ওই লোকটি দাওয়াতে চলে, তাহলে সে আমা থেকে ভালোভাবে চলবে এবং তার দ্বারা দ্বীন প্রসারে অধিক মদদ মিলবে।

আলিমগণকে পৃষ্ঠপোষক মনে করবে

আহলে ইলমদেরকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা মনে করবে। এ কথা মাথায় রেখেই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে; তাঁদের থেকে দুআ নেবে। প্রত্যেক

বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেই তো পরামর্শ ও মাশওয়ারা নেওয়া হয়। যেমন মনে করো কেউ চক্ষু অপারেশনের পরামর্শ নিতে গেলে যে কোনো ডাক্তারের কাছে যাবে না; বরং চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পরামর্শ করতে যাবে। এটা যেমন দুনিয়াবি বিষয়ে। আখেরাতের বিষয়ও তো এরকম। যদি কারো মাসআলা জানার প্রয়োজন হয়, তাহলে সে মুফতীর কাছে যাবে। যে কারো কাছে মাসআলা জানতে চাওয়া উচিত নয়। কারণ মুফতী হচ্ছেন মাসআলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। পরামর্শ না চাওয়ার পরও কেউ পরামর্শ দিতে লাগলে তার কথা গুরুত্বসহ খেয়াল করে শুনে তাকে মুখলিস ও খয়েরখাহ মনে করবে। যাতে সে একথা মনে না করে যে, আমার কথার গুরুত্ব দেওয়া হল না।

দ্বীনের মূল উসূল থেকে দূরে সরার পরিণাম

রাসূল সা. দুনিয়াতে দ্বীন প্রচারের জন্য কিছু বুনিয়াদি উসূল ও নিয়ম রেখে গেছেন। যতদিন পর্যন্ত ওই নিয়মগুলো পরিপূর্ণ যিন্দা থাকবে এবং এগুলোর ওপর উম্মত চলতে থাকবে, এগুলো মেনে কাজ করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত দ্বীনের প্রতিটি বিষয় উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছাতে থাকবে এবং দুনিয়াতে দ্বীন শতভাগ প্রচার-প্রসার হতে থাকবে। রাসূল সা. এর মৃত্যুর কিছুকাল পর ইসলামের এলাকা প্রশস্ত হয়; দলে দলে মানুষ ইসলাম কবুল করতে থাকে। ফলে কিছু কিছু বিষয়ে গবেষণা ও ইস্তেমবাত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এসব ইস্তেমবাতি বিষয় এতবেশি গুরুত্ব পায় যে, মূল উসূলগুলো পর্যন্ত পেছনে পড়ে যায়। যার ফলে দ্বীন সকল উম্মতের কাছে পৌঁছা বন্ধ হতে লাগল; আর কিছু লোক এর দ্বারা উপকৃত হতে থাকে।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় সামনে এল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বীনের এক একটি অংশে নিজের মেহনতকে সীমাবদ্ধ করে ফেলল। মৌলিকভাবে পুরো দ্বীনের উপর তাদের মেহনত থাকেনি।

তৃতীয় আরেকটি বিষয় দেখা দিল যে, পরস্পরে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। ফলে এক বিভাগওয়ালা আরেক বিভাগওয়ালাদের সাথে ।পারে খারাপ ধারণা পোষণ করতে থাকলেন। একজন আরেকজনের সহযোগী বিরোধিতায় লিপ্ত হল। একজন আরেকজনের ব্য হওয়ার পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়ালেন। ফলে দ্বীনের অনেক ক্ষতি ও লোকসান হতে লাগল। তাই দ্বীনের ওই বুনিয়াদি উসূলকে যিন্দা করে এগুলো সামনে রেখে চলতে হবে। এগুলো সামনে রেখে চলা প্রত্যেকের জন্য জরুরি।

বুনিয়াদি উসূল ও নিয়মগুলো হলো এই—

এক. রাসূল সা. সর্বপ্রথম প্রত্যেক উম্মতকে দায়ী (দাওয়াত দেনেওয়ালা) বানান। গরিব হোক বা আমীর; কৃষক হোক বা ব্যবসায়ী— প্রত্যেকে ছিলেন দ্বীনের এক একজন দায়ী; কারণ যখন শতভাগ উম্মত দাওয়াত দিতে থাকবে, তখন দ্বীনও শতভাগে এসে যাবে। তবে প্রত্যেকের দাওয়াত ছিল আপন আপন ইলম অনুযায়ী।

দুই. রাসূল সা. দ্বীন শেখা এবং শেখানোর মূল কেন্দ্র বানিয়েছিলেন মসজিদকে। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম মসজিদে এসেই দ্বীন শিক্ষা করতেন। দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে সাহাবীদের মধ্যে তিন তবকা ছিলেন—

১. যারা বিবি-বাচ্চা ইত্যাদি দুনিয়াবি সকল কাজ থেকে ফারিগ হয়ে আসহাবে সুফফার অংশ হয়েছিলেন।

২. যারা জীবন-ধারণের জন্য কাজ-কর্ম করতেন। তবে বেশিরভাগ সময় তাঁরা দ্বীনের জন্য ফারিগ করে নিতেন। অধিকাংশ মুহাজির ছিলেন এ দলের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আনসারদের ওই তবকা যারা ক্ষেত বাগানসহ দুনিয়াবি অন্যান্য কাজে মশগুল হতেন। তবে কেউ দিনে আর কেউ রাতে আর কেউ দিনের অর্ধেক সময় দ্বীন শেখার কাজে লাগাতেন।

প্রতিদিন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছিল। খুলাফায়ে রাশিদীনের সময়কালে তো অনেক দেশ অনেক শহর ও অঞ্চল বিজয় লাভ করে; বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এর পরও মসজিদের বাইরে কোথাও দ্বীন শেখার জন্য আলাদা কেনো ব্যবস্থা ছিল না; বরং প্রয়োজনমত মসজিদ সম্প্রসারণ করা হচ্ছিল।

এর কারণ এটাই হবে বলে মনে হয়, যে আদব ও সম্মান বজায় রেখে মসজিদে দ্বীন শিখা যায়, মসজিদের বাইরে এগুলো বজায় রাখা মোটেই সম্ভব নয়। যেমন মসজিদে দুনিয়াবি কথাবার্তা, হাসি-টাট্টা, খেল-তামাশা থেকে বিরত থাকা, ওযুসহ থাকা, যিকিরের অবস্থায় থাকা, তাকবীরে উলার সাথে নামায পড়ার ইহতেমাম—ইত্যাদি এমন অনেক জিনিস, যা দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও আযমত পয়দা করে। সাথে সাথে আমল করার প্রতি পথনির্দেশ করে। দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে বড়দের প্রতি নির্দেশ এবং কুরআন শরীফে সম্বোধনের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রথম বানিয়েছে। বড়দেরকে একথা বলা হয়নি যে, তোমার ব্যবসা-বানিজ্য, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি কাজে মশগুল থাকায় তোমারা মাযূর; তাই তোমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও, আসহাবে সুফফাওয়ালারা দ্বীন শেখাবে; বরং বড়দেরকে গুরুত্বসহ ডেকে পাঠানো হয়েছে। বৃদ্ধ হোক বা যুবক, কৃষক হোক বা ব্যবসায়ী প্রত্যেককে দ্বীন শিখতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ দ্বীনকে বড়রাই তো আপন ঘরে, ব্যবসা বানিজ্যে ও লেনদেন ইত্যাদিতে বাস্তবায়ন করবে। বাস্তবায়ন করা তো ছোটদের কাজ নয়। জান্নাত-জাহান্নাম বিশ্বাস করে তো বড়রাই কাজ কাম করবে— ছোটরা নয়। বড়রাই তো আল্লাহর আদেশ-নিষেধের আযমত ও সম্মান বুঝবে।

তিন. কেনো পারিশ্রমিক ছাড়াই দ্বীন শেখা-শেখানোর ব্যবস্থা করেন। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তার অধীনস্থদেরকে দ্বীন শেখানোর যিম্মাদার।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

রাসূল সা. বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেক দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককে আপন অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে' এটি এ বিষয়ের ওপর সুস্পষ্ট প্রমাণ। যখন প্রত্যেকে আপন ঘরে দ্বীন শিক্ষা দেবে এবং আপন বাচ্চাদেরকে শিক্ষার্থী বানাবে তখন পারিশ্রমিকের তো প্রশ্নই আসবে না। এভাবেই পারিশ্রমিক ও বদলা ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বীন শিখনেওয়ালা, শেখানেওয়ালা হতে পারবে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হয়েছিলেন। দ্বীন মানুষের আত্মার জন্য এরকম জরুরি—শরীরের জন্য যেমন বাতাস ও পানি। আল্লাহপাক বাতাস ও পানিকে সকল মানুষের জন্য ফ্রি করে দিয়েছেন। তেমনি দ্বীন শেখা ও শেখানোকে বিনা পারিশ্রমিকে রাখা হয়েছে। যাতে প্রত্যেক গরিব, মিসকিন, ইয়াতিম, গ্রামের অধিবাসী, পাহাড়-জঙ্গলের অধিবাসী সবাই দ্বীন শিখতে পারে। দ্বীন শেখা-শেখানোর জন্য চাঁদা করা হয়নি; আর না চাঁদা দিতে উৎসাহিত করা হয়। আর না কারো দায়িত্বে তা ঠিক করে দেওয়া হয়।

আসহাবে সুফফার খানা না আবু বকর রাযি. এর দায়িত্বে ছিল, আর না উসমান ও আবদুর রহমান বিন আউফ রাযি. এর দায়িত্বে, আর না আসহাবে সুফফার জন্য ধনীদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয়েছিল; বরং তারা ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত থেকে কষ্ট করে দ্বীন শিখেছিলেন। যার ফলে দ্বীনের গুরুত্ব ও সম্মান তাঁদের অন্তরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাদরাসার জন্য ব্যয় করার মতো অনেক লোক মদিনায় ছিলেন—যাঁরা একটিমাত্র ইশারায় নিজের সকল সম্পদ খরচ করে দিতেন। জিহাদের জন্য মাল খরচ করতে উৎসাহিত করা হত; কারণ এর জন্য সওয়ারী, হাতিয়ার ও পথ-খরচের প্রয়োজন ছিল।

চার. দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ঈমানিয়াত এরপর আখলাকিয়াত (আচার আচরণ) শিক্ষা দেওয়া হত। যার প্রমাণ এই হাদীসে পাওয়া যায়— 'হাবশার বাদশাহ যখন হযরত জাফর বিন আবু তালিব রাযি.কে প্রশ্ন করেন, তোমাদের নবী তোমাদের কী শিক্ষা দেন? তখন তিনি জবাবে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা যেন একটু চিন্তা করি। কারণ শরীয়তের আহকামের উপর ওইসব গুণাবলি অর্জনের দ্বারাই আমল করা সহজ হয়, অন্যথায় আল্লাহর আহকামের উপর আমল করা ততো সহজ হয় না। বর্তমান সময়ে দ্বীন শিখা-শেখানোর পদ্ধতি ও তারতীব বদলে যাওয়ায় আমল করা কষ্ট হচ্ছে। যদি ঈমানিয়াত ও আখলাকিয়াত প্রথমেই শেখানো হতো তাহলে মানুষ ঈমানের শক্তি নিয়ে আখেরাতকে সামনে রেখে দিন গুজরান করে কামিল হয়ে যেত। আখলাকিয়াত মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে এসে গেলে তখন পারস্পরিক লেনদেনের জন্য বিচার-আদালত ও ঝগড়া-ঝাটির প্রয়োজন হবে না; বরং সাহাবীদের মতো অনেক বিষয়ে মতবিরোধ হওয়ার পরও পরস্পরে ইত্তেফাক, ইত্তেহাদ ও মিল-মহব্বত এবং ইকরাম বাকি থাকবে।

ওই মূলনীতিগুলো সামনে রেখে পরবর্তীতে উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে মাদরাসা ও খানকাসমূহে যদি বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহলে তা খুবই উপকারী ও ফলদায়ক হবে। শিক্ষাদানের বর্তমান পদ্ধতিগুলোও কিন্তু খুবই জরুরি। তবে এর প্রয়োজনীয়তা বুনিয়াদি উসূল থেকে কম জরুরি। বর্তমানে বুনিয়াদি জিনিসগুলো বাকি না থাকায় ঈমানিয়াত এত বেশি দুর্বল হয়েছে যে, ফরযের ইহতেমাম নফল থেকে কমে গেছে। ফলে দ্বীন গুরুত্ব ও আযমতসহ এবং তাকওয়া ও তায়াক্কুলের সাথে শেখা হচ্ছে না। যার ফলে দেখা যাচ্ছে, আজ দ্বীনদারদের মতবিরোধ ও পরস্পর বিরোধিতা এমন শত্রুতায় পৌঁছেছে; যাতে দুনিয়াওয়ালারা পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

যদি আমাদের শিখা-শেখানো সাহাবায়ে কেরামের তারতীবে এসে যেত। তাঁরা যেভাবে দাওয়াতের ময়দানে চলতে চলতে শিখছেন ও শেখাচ্ছেন—তাহলে এখনো দ্বীনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা শতভাগ উম্মতের মধ্যে যিন্দা হয়ে যেত। আর ইলম ও যিকির যা দ্বীনের মূল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানের জন্য শক্তিবর্ধক তা প্রতিটি পাকা ও কাঁচা ঘরে এবং 'কলবে সালীম'ওয়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সসম্মানে প্রবেশ হতে পারত। ঈমানি সিফতবিহীন আমল দুর্বল হয়। ঈমানি সিফতগুলো হল— তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, দুনিয়াবিমুখতা, অল্পেতুষ্টি, সবর, শুকর ও আল্লাহর মহব্বত। এ গুণাবলি যখন আমলে এসে যায়, তখন আমলের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। এবং আশা-নিরাশার অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর যখন এসব গুণ মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে তখন আমল কঠিন হয়ে যায়। নেক আমল দ্বারা ইয়াকিন পয়দা হওয়ার পরিবর্তে আসবাব দ্বারা ইয়াকিন হতে আরম্ভ করে। আর তখনই দ্বীনের উপর দুনিয়া প্রাধান্য পেতে থাকে। দুনিয়া মানুষের মন-মগজে জেকে বসে এবং অন্তরে দুনিয়ার এমন মহব্বত ও আযমত সৃষ্টি হয় যে, এর বিপরীতে ফরযসমূহ আদায় করার পর্যন্ত গুরুত্ব থাকে না। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি হল, ঈমানের গুণাবলি সৃষ্টিকারী। আর ঈমানের গুণাবলি দ্বারাই মুমিন প্রকৃত মুমিন ও সম্মানী বনে। এসব গুণাবলির মাধ্যমেই গরিব-ধনী একে অপরের সহায়ক এবং পরস্পরে সহানুভূতিশীল হয়। এর মাধ্যমেই প্রত্যেকেরই আপন দায়িত্ব সম্পর্কে ফিকির বাড়ে।

ক্ষমা চাওয়া এবং ক্ষমা করা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। এ দু'টি গুণ যে মুসলমানের মধ্যে এসে যাবে, আল্লাহপাক তার জন্য ক্ষমাকারী ও দয়াবান হয়ে যান।

সকল মানুষ যদি একথা বুঝে নিত যে, এ দাওয়াত দ্বারা কী চাওয়া হচ্ছে এবং এর দ্বারা কী ফলাফল প্রকাশ পায়? তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি এ কাজে নিজের জীবন ওয়াকফ করে দিতে তৈরি হয়ে যেত। কিন্তু আমরা অযোগ্য; নিজেদের কথাকে বুঝাতে পারছি না। আর খারাপ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী আমাদের পুরাতন দুশমন শয়তান ও নফস— আমাদেরকে সঠিকভাবে দাওয়াতের উপর চলতে বাধা প্রদান করে। এ দাওয়াত দুশমনকে বন্ধু বানানেওয়ালা। কিন্তু আমাদের কোনো কোনো বেউসূলির

কারণে নিজের মানুষও পর হয়ে যায়। আমরা সকল কথা সঠিকভাবে বুঝাতে পারি না। হেকমতের সাথে মানুষ নিয়ে যদি চলি, তাহলে ইনশাআল্লাহ সবাই আপন হয়ে যাবে।

ইকরামে মুসলিম বা মুসলমানের সম্মান করা হচ্ছে দাওয়াতের বড় একটি হাতিয়ার যা ভীষণ ও কট্টর শত্রুকে পর্যন্ত মস্তকাবনাত করতে বাধ্য করে। তবে এ গুণ নিজের মধ্যে অর্জন করতে নফসের সাথে খুবই মুজাহাদা ও চেষ্টার প্রয়োজন পড়ে। বিরোধীদের লানত, দোষারোপ ও কষ্ট প্রদানকে সহ্য করতে হয়। এ সহ্য দ্বারা নিজে সঠিক বনা যায় এবং অন্যকে সঠিক বানাতে সাহায্য করে। وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "ভালো ও খারাপ আচরণ সমান নয়। সবসময় ভালো আচরণ দ্বারা অন্যকে প্রতিহত করো"—এ কথাটি যেন সব সময় মনে থাকে।

আমরা কোনো মুসলমানকে যেন আমাদের বিরোধী ও দ্বীন প্রতিহতকারী মনে না করি; বরং একথা যেন ভাবি, তার এমন অনেক অবস্থা রয়েছে, যা তাকে আমাদের কথা কবুল করতে বাধা দিচ্ছে। দ্বীনের ওই কথাটি যা আমরা তাকে বলছি, তা যদি এমন ব্যক্তি বলতেন—যার সাথে তার আস্থা ও ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে; তাহলে সে সাথে সাথে মেনে নিত। এ থেকে বুঝা গেল যে, সে দ্বীনের বিরোধী নয়; বরং আমাদের অবস্থার কারণে সে আমাদেরকে ভয় করছে। আর এ কারণে সে তা গ্রহণ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগছে যে, এরা আমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। তবে কোনো কালেমা পাঠকারী মুসলমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথাকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। যখন তার ইয়াকিন হয়ে যাবে যে, নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা। কিন্তু বর্তমান সময়ের অবস্থা ও সিস্টেম মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। কারণ বাহ্যিকভাবে ফেরেশতার মতো অনেক লোক দ্বীনের নামে দুনিয়াওয়ালাদেরকে ধোঁকা দিয়ে চলেছে এবং দ্বীনকে পুঁজি করে নিজের যশ-খ্যাতি ও সম্মান ও দুনিয়া বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ও আশঙ্কা বিরাজমান। যেমন একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ- দুধে মুখ জ্বালানো ব্যক্তি দইও ফু দিয়ে পান করে।

একটি কথা খুবই মনে রাখতে হবে— আমরা যেন নিজেদেরকে বুঝদার মনে না করি। তাহলে আমরা এ কাজকে বুঝতে চেষ্টা করব এবং উন্নতি করতে থাকব। যখন মানুষ নিজেকে বুঝদার ও কামিল মনে করে নেয়, তখন তার উন্নতির রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে শয়তান তাকে ধোঁকায় ফেলে ওখান থেকে সরিয়ে দেয়।

হযরতজি রাহ. বলেন, এ কাজ করনেওয়ালাদের ব্যাপারে আমার দু'টি আশঙ্কা

১. কাজ না করেও মনে করবে কাজ করয়ী। কাজ তো হল ওই ছয়টি গুণ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা। আমাদের মধ্যে এ ছয়টি গুণ এসে গেলে আমরা কামিয়াব এবং বুঝা গেল—আমরা কাজ করি। আর যদি নিজেদের মধ্যে এ গুণগুলো না আসে, তাহলে যতবেশি লোকই আমাদের দাওয়াতে আসুক না কেন—বুঝা যাবে আমাদের কাজ হয়নি।

২. আসবাব-উপকরণ থাকবে, তবে এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবে না। এটা বড় মুশকিল ব্যাপার। কিন্তু আসবাবের প্রতি মনোযোগ হয়ে গেলে আল্লাহর সাহায্য সরে যায়। অনেক চিন্তা ফিকিরের পর একটি কথা আমার বুঝে এসেছে যে, যদি কারো নিজের ব্যাপারে এমন ভাব সৃষ্টি হয় যে, আমি তো কাজ করনেওয়ালা। আমার কারণে দাওয়াত চলছে। যেকোনো এলাকায় বা সারা দুনিয়ায়। তাহলে ওই ব্যক্তি যেন আল্লাহকে ভয় করে যে, আল্লাহ যেন তাকে ওই কাজ থেকে মাহরূম করে না দেন।

এমনও অনেক দেখা গেছে যে, মানুষের মনোযোগ যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি জমে যায় যে, ওনার কারণে দাওয়াতের এ গাড়ি চলছে তাহলে আল্লাহপাক ওই ব্যক্তিকে তাদের মধ্য থেকে উঠিয়ে নেন। কারণ এ দু'টি জিনিস হল আসবারেব উপর ভরসা। অথচ সবকিছু আল্লাহ করছেন। কখনো আসবাবের মাধ্যমে আর কখনো আসবাব ছাড়া। সবসময় চোখ ও মন যেন আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থাকে।

এ ছাড়া এ-ও দেখা গেছে যে, কেউ দ্বীনের কাজকে তাচ্ছিল্য ও হালকা মনে করলে তাচ্ছিল্যকারী ভয়াল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যায়। এমনকি কখনো এমন কাজ করতে থাকে বা এমন কথা বলতে থাকে যা তার ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

এভাবে কারো উপর অভিযোগ করা হচ্ছে, সে দাওয়াতের মিযাজের খেলাফ। হযরতজি ইলয়াস রাহ. এর ভাষায়— 'কারো উপর অভিযোগ ও এতেরায করা হারাম, আর নিজের ইসলাহ ও সংশোধন করা ফরয।'

অভিযোগ ফিতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি করে। অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম দেয়। সংশোধন বিষণ্ণতা ও আফসূসের দিকে নিয়ে যায়। আজ উম্মতের অবস্থার উপর পেরেশানি ও বিষণ্ণতা বাড়ানো উচিত। যা আমাদের মধ্যে নেই। অভিযোগ থেকে দূরে থাকা খুবই জরুরি। এটি আজ আমাদের মধ্যে খুবই বেশি। অভিযোগ ও পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির কারণেই আজ উম্মত টুকরো টুকরো হতে চলছে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি উম্মতের প্রতি সহানুভূতিশীল ও অনুগ্রহকারী হয়ে যেত; তাহলে এ দাওয়াত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যেত; বরং এ দাওয়াতের অবস্থা তো এমন যে, অন্যদের অভিযোগের জবাব পর্যন্ত দেওয়া হয় না। না মৌখিকভাবে আর না লিখিতভাবে। না ইশারা ইঙ্গিতে আর না স্পষ্টভাবে। এর দ্বারা শত্রুতা ও বিদ্বেষের পথ উন্মুক্ত হয়; বরং অভিযোগকারীকে একরাম করে কাছে এনে অন্তরঙ্গ করতে হবে। এরপর অভিযোগ এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। তখন কথা বুঝা সহজ হয়ে যায়। অভিযোগ ও প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রশ্ন নিজের কাজ স্বীকার করে হয় যে, আমি এ কাজ জানি না। এ সময় কিন্তু জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির সম্মান ও আযমত অন্তরে থাকে। আর অভিযোগ হল, নিজে জানি দাবি করে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে মূর্খ মনে করা হয়। এ কারণে প্রশ্ন করা হয় 'জানা ও বুঝার জন্য'। তবে কখনো কখনো মানুষ অভিযোগকে প্রশ্ন মনে করে বসে। এটা শয়তানি ধোঁকা যে, আমি শুধু প্রশ্ন করতে থাকব।

হেকমত শিখতে হয়, যা এ কাজ বুঝতে ও বুঝাতে সহায়ক।

দাওয়াত দিতে হলে হেকমত শিখতে হয়, যা এ কাজ বুঝতে ও বুঝাতে সহায়ক। হেকমত তো মূলত আল্লাহর দান। যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে দেন। এর প্রতিই কুরআনের আয়াত ইঙ্গিত করছে وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا 'যাঁকে হেকমত দেওয়া হয় তাঁকে অনেক অনেক কল্যাণ দেওয়া হল।' শুধু দেওয়া হয় তা নয়; বরং হেকমত শিখতেও হয়। যেমন আল্লাহপাক অন্য আয়াতে বলেন وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 'এবং রাসূল সা. তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিতেন'। তাই কিতাব ও হেকমত শিক্ষা করা উচিত। যেমন কুরআন শিক্ষা করা হয় তেমনি হেকমতও শিক্ষা করতে হবে। তবে এ হেকমত ওই ব্যক্তিরই মধ্যে আসে; যার মধ্যে পবিত্রতার গুণাবলি সৃষ্টি হয় ও পদস্খলনের গুণাবলি দুর্বল ও পরাজিত থাকে। এ কারণে হেকমতের মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে হকের জন্য প্রস্তুত করতে হলে আল্লাহপাকের কাছে দুআর মাধ্যমে সাহায্য চাইতে হবে। অন্যথায় হেকমতপূর্ণ কথা তো মুনাফিকের জবান দিয়েও বের হতে পারে তখন ওই বাণীর মিসদাক বনে যাবে। السنتهم السنة الحكماء، وقلوبهم قلوب المنافقين 'এদের কথা হল জ্ঞানীদের কথার মতো; আর অন্তর হল মুনাফিকদের অন্তরের ন্যায়'। দাওয়াতের কাজে বিনয় ও নম্রতা যত বাড়তে থাকবে ততো নিজের মূর্খতা প্রকাশ হতে থাকবে। আর যখন নিজের মূর্খতা বুঝতে পারবে তখন ইলমের দরজা খুলতে থাকবে। কারণ তখন সঠিক তলব পয়দা হবে। আর তলবই প্রত্যেক জিনিসের বাঁধ ডিঙ্গিয়ে পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এ ছাড়া শয়তান মানুষকে বুযুর্গ ও মুরব্বিদের নেগরানিতে চলতে বাঁধা দেয়। মানুষকে মুরব্বিদের নেগরানি থেকে সরাতে চেষ্টা করে। আর এরকম বিপথগামী লোকদের মাধ্যমেই দুনিয়াতে বড় বড় ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে।

রাসূল সা. আল্লাহর নেগরানি ও তত্ত্বাবধানে চলতেন। সাথে সাথে জিবরীল আ. ও সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ নিয়ে চলতেন। যেমন কুরআন শরীফে এসেছে وشاورهم في الأمر 'এবং আপনি তাদের সাথে দ্বীনের কাজে পরামর্শ করুন।' এভাবে সাহাবায়ে কেরাম চলতেন রাসূল সা. এর নেগরানিতে। যেমন কুরআন পাকে এসেছে وامرهم شورى بينهم 'এবং তাঁদের কাজ পরস্পরে পরামর্শের মাধ্যমে চলত'। এরকম পরবর্তীতে আনেওয়ালারা পূর্ববর্তীদের নেগরানিতে চলনেওয়ালা ছিল। যার ফলে উম্মত পরস্পরে জুড়ে ছিল। তাঁরা ছিল হেদায়তের উপর। নেগরানিতে থাকার উপরই জুড়ে থাকা ও হেদায়ত নির্ভরশীল।

যখন থেকে আমরা নিজেদেরকে বড় মনে করে মুরব্বিদের নেগরানি ও মাশওয়ারাকে ছেড়ে দিয়েছি। তখন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়েছি এবং গুমরাহির রাস্তা ধরেছি। এখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের রায় ও মতামতকে সঠিক মনে করতে আরম্ভ করেছে। যা খুবই বিপজ্জনক। শয়তান নিজের মতামতকে সঠিক মনে করে আল্লাহর আদেশকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে। একথা খুবই মূর্খতাপূর্ণ হবে, যদি কেউ

বলে—আমি ইলয়াস রাহ. থেকে ফয়েয ও সুহবত হাসিল করেছি। সরাসরি উনার কথা শুনেছি। তাঁর কাছ থেকে সকল নিয়মকানুন জেনেছি। তাই আমি কারো পরামর্শের মুখাপেক্ষী নই। বা বড়দের নেগরানির মুহতাজ নই। এ ধরনের কথা খুবই মারাত্মক ও বিপজ্জনক। এমন লোক কখনো উম্মতকে জুড়তে পারবে না এবং তাদের সংশোধনও করতে পারবে না। আর দাওয়াতের বড় দু'টি কাজ হল, হকের উপর চলা আর উম্মতকে জুড়া ।

এ ছয় নম্বর যদিও সরাসরি কুরআন বা হাদীসে কাতয়ী নয়। তবে কুরআন ও হাদীস থেকে সংগৃহীত। এ কথা সহীহ ইলম ও ইয়াকিনওয়ালা কোনো উম্মত অস্বীকার করতে পারবে না এবং এগুলোর উপর কোনো ধরনের অভিযোগ উত্থাপনেরও সুযোগ নেই। তবে এ কাজের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন গাশত, তালীমের হালকা, বাহির হওয়া ও বাহির করা ইত্যাদিতে গভীর চিন্তা করলে দু'টি কথা বুঝা যাবে।

এক. এগুলোর মাধ্যমে অন্তর আল্লাহ ও আখিরাতমুখী হয় কি না? অভিজ্ঞতার আলোকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত ও জুড়নেওয়ালাদের রুখ আল্লাহপাক নিজের দিকে বদলে দেন।

দুই. এ পদ্ধতি দ্বারা বিনয়, ভালবাসা ও অন্যান্য উত্তম গুণাবলি সৃষ্টি হয়। তবে তা তখনই অর্জিত হবে যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পূর্ণ নিয়মকানুন মেনে বের হবে। দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য হবে না। আর বের হওয়ার পর সময়কে সঠিকভাবে আমীরের আদেশ অনুযায়ী কাজে লাগাবে।

কখনো কখনো আল্লাহপাক এ কাজ করনেওয়ালাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন; যা এ কাজের সাথীদের সাহায্য ও নুসরতের পথ উন্মুক্ত করার জন্য হয়। কখনো পরীক্ষা ছাড়া গায়েবি নুসরত ও সাহায্য আসে না। যেমন কুরআন শরীফে এসেছে, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ 'এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং মাল জান ও ফলের ক্ষতিসাধণ করে পরীক্ষা করব'।

অন্য আয়াতে এসেছে, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ... "তোমরা কি মনে করো—তোমরা পূর্ববর্তীদের ন্যায় পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে?"

কুরআনের আয়াত এবং সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ও পরীক্ষা এ কথার ওপর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ ছাড়া এর মাধ্যমে চরিত্রের উন্নতি হয়। আসবাব থেকে ইয়াকিন দূর হয়; হেকমতের পর্দা খুলে; বুদ্ধিমত্তা বাড়ে; অন্তর্দৃষ্টি অর্জিত হয়; গায়েবি নেযাম বুঝে আসে। এ ছাড়া আল্লাহর বড় বড় এসব হেকমত লুকিয়ে আছে যা আমাদের জ্ঞান বুঝতে অক্ষম। তবে নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের কারণে এমনভাবে দুআ ও আহাজারি করতে থাকবে যে, হঠাৎ যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে'? শুধু কষ্টের কারণে নয়; বরং বেচয়নি ও বেকারারির

সাথে মুখ দিয়ে অনিচ্ছাবশত এ বাক্য বলতে থাকবে। তখন 'الا ان نصر الله قريب' জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী'—বাস্তবতা লাভ করবে।

পরীক্ষা ও মুসীবত শেষ হলে তখন ঝুকি ও আশঙ্কার ঘাটসমূহ শুরু হয়। আর তখনই মানুষ আপন অবস্থান থেকে নিচে নামতে শুরু করে। তখন উত্তম গুণাবলিতে ঘাটতি দেখা দেয়। ইয়াকিন ও বিশ্বাস কমতে থাকে।

রাসূল সা. এর তেইশ বৎসরের নুবুওয়াতি জীবন পরীক্ষা ও বিপদাপদের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তেমনি আবু বকর রাযি. এর খেলাফতকালও এরকম কাটে। কিন্তু উমর রাযি. এর খেলাফতকালে পরীক্ষা ও বিপদের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সবধরনের সুবিধা ও আরামের সময় শুরু হয়। যার কারণে একটু থামতে হয়। এর পূর্বে তো পরীক্ষা ও বিপদাপদ ঢালের কাজ দিত।

তেমনি মাওলানা ইলয়াস রাহ.এর সময়কালে আমরা যা দেখেছি বা শুনেছি— তা পরীক্ষা বলে মনে হতো। মানুষ ব্যাপকভাবে এ কাজকে সমর্থন করত না। মাঝে মধ্যে কেউ তিনদিনের জন্য বের হত। এ কাজের প্রশংসাকারী খুবই কম পাওয়া যেত; বরং বেশিরভাগ মানুষ খারাপ ধারণা করত। আলিমগণ পর্যন্ত হতাশা ব্যক্ত করতেন। নিরাশার কথা শোনাতেন। এ কাজের উপর বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। অনেকে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করতেন। জামাতসমূহের না ইস্তেকবাল করা হত, আর না খানার দাওয়াত দেওয়া হত; বরং আপন মসজিদে অবস্থান করাকে পর্যন্ত মেনে নিতে পারত না। পায়ে হাটা, চানা চিবুনো, পাতা খাওয়া এর উপর নানা ধরনের কটুক্তি শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হত। এ সময় ছিল খুবই পরীক্ষার। তবে এখন উমরের সময়কালের ন্যায় ইস্তেকবাল হচ্ছে। দাওয়াতের এতবেশি জোর যে, প্রত্যেক দিক থেকে আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমান সময়ে বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি বাকরি ছেড়ে, নিজের আরাম আয়েশকে পরিত্যাগ করে, ঘরের পরিবেশকে ছেড়ে এ কাজে বের হওয়া মামুলি ব্যাপার। তখনকার সময়ে অবসর বেশি ছিল আর বর্তমান সময়ে ব্যস্ততা বেশি। এটাও এক ধরনের কোরবানি। তখন কাজ কম ছিল তাই যিকির ও তাহাজ্জুদের জন্য সময় বেশি পাওয়া যেত। আর এখন কাজ বেশি। জামাতসমূহের ভিড়, তাশকীল, হেদায়ত ও রওয়ানা ইত্যাদি এমনভাবে বেড়েছে যে, যিকির পূরা করা পর্যন্ত মুশকিল হয়ে যায়। রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার ফুরসত মেলে না। এ অবস্থা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এর জন্য নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

বর্তমানে একটি কথা বার বার শোনা যাচ্ছে যে, কাজের বিস্তৃতির চেয়ে উন্নতির চেষ্টা করো। আমার কাছে মনে হয় এটা শয়তানের একটি ধোঁকা। কারণ এটা না খুলাফায়ে রাশিদীনের সময়কালে করা হয়েছিল আর না তাবেয়ীন ও তবয়ে তাবেয়ীনের সময়কালে যে, প্রচার প্রসার থামিয়ে মান বাড়াতে লেগে যাও। আর না এটা দাওয়াতের মিযাজ বা প্রকৃতি। দাওয়াতের মিযাজ ও স্বভাব এই যে, প্রচার প্রসারের সাথে সাথে উত্তমতারও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কারণ প্রচার প্রসারকে থামিয়ে এর অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত

করলে দাওয়াত খতম হয়ে যাবে। দুনিয়াওয়ালারাও আপন ব্যবসা-বাণিজ্যে এ চেষ্টা করে না; বরং দেখা যায়-নিজের ব্যবসায়ী পণ্যের প্রচার প্রসারের প্রচেষ্টা করতে থাকে আর এর সাথে সাথে পণ্যের মানও কমতে থাকে।

এটা এক কুদরতি নিয়ম যে, যখনই প্রচার-প্রসার বড়তে থাকবে তখন মান কমতে থাকবে। উমর রাযি. এর খেলাফতকালে নতুন নতুন শহর বিজীত হচ্ছিল, চতুর্দিকে ইসলাম বিস্তার লাভ করয়ীল। তখন গভীরতা ও মানে কমতি হচ্ছিল এবং মানুষের মধ্যে প্রত্যেক জিনিসের অবস্থা দুর্বল হচ্ছিল। কুরআনের আয়াতই এর প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন আল্লাহ বলেন,لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ 'যাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় দান ও জিহাদ করেছে আর যাঁরা পরে এগুলো করেছে তাঁরা উভয় কি সমান'? আমলের গভীরতা ও উত্তমতা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ছিল। মক্কা বিজয়ের পর অবস্থায় পরিবর্তন আসে এবং উত্তমতা কমতে থাকে। এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যা প্রত্যেকেরে বুঝে আসে না; বরং অনেকের প্রশ্ন জাগতে পারে। প্রচারকে বাধা দিয়ে কাজের গভীরতায় লাগা দাওয়াতের মিযাজ নয়। দাওয়াত চললে তখন প্রচার প্রসার হবেই। আর দাওয়াত তো হলো প্রচারের জন্য। নতুন নতুন মানুষ যখনই ইসলাম কবুল করবে; দাওয়াতের জন্য দাঁড়াবে—তাদের গভীরতা পুরনোদের মতো কখনো হবে না। যেমন لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ... আয়াতটি উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। খুলাফায়ে রাশিদীনের সময়কালও পার্থক্য দেখাচ্ছে যে, হযতর আবু বকর রাযি. এর খেলাফতকালে যে গভীরতা ছিল, উমর রাযি. এর সময়কালে তা ছিল না। আর উমরের খেলাফতকালে যে গভীরতা ছিল, উসমান রাযি. এর খেলাফতকালে তা ছিল না। তবে ইসলাম দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছুতে ছিল। তাই মানুষের এ বাক্য দ্বারা ধোঁকায় পড়া ঠিক নয়। তবে কাজ করনেওয়ালাদের অবশ্যই এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগী করবে যে, নিজেদের মধ্যে যেন উত্তম গুণাবলি ও ইয়াকিন বাড়ানোর চেষ্টা করে।

দাওয়াতের কাজ করনেওয়ালাদের জন্য বড় একটি শর্ত হল, এ কাজের সাথীরা যেন বর্তমান সময়ের প্রচলিত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তা থেকে অনেক অনেক দূরে থাকে। বদর প্রান্তরের দিকে যাওয়ার সময় যখন রাসূল সা. জানতে পারেন যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের মুকাবালার জন্য বেরিয়ে পড়েছে— আর একথা স্পষ্ট যে কুরাইশরা তাদের পূর্ণ শক্তি ও সমরাস্ত্র নিয়েই রওয়ানা দিয়েছিল। অপরদিকে মদিনা মুনাওয়ারা রাসূল সা. এর একেবারে কাছে, মাত্র দুই মনযিল দূরত্বে—এরপরও রাসূল সা. মদিনা থেকে শক্তি ডেকে পাঠাননি। অথচ চাইলে যুদ্ধাস্ত্র লোকবল নিয়ে আসতে পারতেন। এগুলো ডেকে পাঠাতে কী বাধা ছিল? কী ছিল এতে রাজনীতির গোপন রহস্য? এভাবে রাসূল সা. এর প্রতিটি গাযওয়া ও প্রতিটি সফর হল গভীর ও সূক্ষ্ম রাজনীতির একটি একটি পাঠ। যা তৎকালীন রাজনীতিবিদদের চিন্তা-চেতনার গভীর আঘাত করত। তাঁদেরকে হতভম্ব ও পেরেশনা করে দিত।

গাযওয়ায়ে মুতা-এ রাসূল সা. কে যুদ্ধের নকশা দেখানো হয়েছিল। রাসূল সা. এ-ও জানতেন যে, আমি যে অল্প সংখ্যক মুজাহিদ পাঠাচ্ছি এঁরা রোমের বিরাট সৈন্যবাহিনীর মুকাবালায় একেবারে কম। তখন কিন্তু রাসূল সা. এর কাছে মুসলমানদের সংখ্যা এত কম ছিল না। তা হলে গাযওয়ায়ে মুতায় কী রহস্য লুকায়িত?

জাগতিক ও দুনিয়াবি ফায়দা অর্জনের লক্ষ্যে কাফিররাও রাজনীতি করে। তবে নবী সা. এর রাজনীতি ছিল মানুষের দিল আল্লাহর দিকে ফেরানোর লক্ষ্যে। নবীর রাজনীতির দ্বারা মানুষের মধ্যে তাওয়াক্কুল ও তাকওয়া সৃষ্টি হত। আর বর্তমান যামানার রাজনীতির মাধ্যমে উম্মত টুকরো টুকরো হয়। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে কী করে জয়ী হবে—নিজের মানুষকে পর্যন্ত জুড়তে পারে না।

এ ছাড়া দাওয়াতের কাজের জন্য জরুরি হল, শাখা-প্রশাখাগত মাসাইলের ইখতেলাফ থেকে দূরে থাকা। কারণ বর্তমান সময়ে শাখা-প্রশাখাগত মাসাইলের ইখতেলাফ লড়াই ও ঝগড়া ফ্যাসাদের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ ধরনের ইখতেলাফে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মহব্বত, ইত্তেফাক ও ঐক্যে কোনো ধরনের কমতি হত না। এর দ্বারা পরস্পর-বিরোধিতা জন্ম নিত না। আর বর্তমান সময়ের ইখতেলাফে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। মহব্বতের জায়গায় দুশমনি জন্ম নেয়। তাই দাওয়াতের সাথীদেরকে প্রচলিত রাজনীতি ও বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো হওয়া এবং পরস্পর বিরোধিতা থেকে হেফাযত করা হয়েছে। এ কারণে দেখা যায় যে, আহলে হকের অনুসারী প্রত্যেক মাযহাবের লোকেরা এ কাজ করতে এগিয়ে এসেছে। সবাই এ কাজে জুড়ছে। প্রত্যেক মাযহাবের উলামায়ে কেরাম এ দাওয়াতের উসূল ও মূলনীতিগুলো পছন্দ করে এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

এ কাজে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ও বিপদ হচ্ছে বয়ানকারীদের নিয়ে। এরা আপন বয়ানে হয়ত উসূল থেকে সরে গিয়ে কারো বিরোধিতা, কারো উপর হামলা, কারো উপর অভিযোগ বা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করে বসে। অথবা দেখা যায় যে, বয়ানে তাওয়াযু ও বিনয়ের পরিবর্তে অহঙ্কার ও কিবিরের অবস্থা প্রকাশ পায়। যা এ দাওয়াতের কাজের জন্য মারাত্মক বিপদ। এ দাওয়াতের বয়ান হবে তোষামোদ হিসাবে। যেমন ছোটরা বড়দের সাথে কথা বলছে। তেমনিভাবে কখনো কোনো জিনিসের ত্রুটি বা কমি বলতে হলে তখন 'আমাদের' শব্দ ব্যবহার করবে। যেমন আমাদের থেকে এ ত্রুটি হচ্ছে। আমাদের এ কমি রয়েছে। আর প্রশংসার কথা আসলে তখন 'আপনি' শব্দ ব্যবহার করবে। আর এটা কেবল শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নয়; বরং মন থেকে নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করে কথা বলবে। নিজের দোষত্রুটি ও কমিগুলো সবসময় সামনে থাকবে। তাহলে অন্যের দোষ-ত্রুটি ও কমির কারণে তাদের উপর অভিযোগ বা নফরত সৃষ্টি হবে না। কারণ এটাও ইকরামের খেলাফ।

ইকরামে মুসলিম একটি গুরুত্বপূর্ণ নম্বর

আসল ইকরাম তো তিন রকম লোকের হতে হবে।

১. আপন সাথীদের। ২. উলামায়ে কেরামের। ৩. সাধারণ মানুষের।

এ তিন তবকার ইকরাম মন ও দিল থেকে ইখলাসের সাথে করার চেষ্টা করবে এবং তা মশক ও প্রশিক্ষণ করবে। আর এর প্রশিক্ষণ এরকম নয়— যেমন অমুসলিম শক্তিসমূহ করে থাকে; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির কোনো না কোনো ভালো গুণ রয়েছে। তা সামনে রেখে চিন্তা করবে। এটা তো আল্লাহর কাছে প্রিয়। মুসলমানের মধ্যে অন্তত অন্য কোনো গুণ না পেলে কালেমার গুণ তো অবশ্যই আছে। এটা তো হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুণ। এর কারণে কাউকে সম্মান করার অর্থ হল কালেমারই সম্মান করা। আর কালেমার সম্মান করার অর্থ হল আল্লাহরই সম্মান করা।

যে আপন সাথীদের সাথে খারাপ আচরণ করবে, সে অন্যদের যতই ইকরাম ও সম্মান করুক না কেন—তার মধ্যে ইকরামের সিফত সৃষ্টি হবে না। তখন এটাকে একটি রুসম ও প্রথা মনে করা হবে। আপন সাথীদের ইকরামের মধ্যে নিজের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের ইকরামও অন্তর্ভুক্ত। এর পর খাওয়াস ও বিশেষ ব্যক্তিদের। অমুসলিমদেরও ইকরাম করবে। হযরত আদি বিন হাতিম ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যখন রাসূল সা. এর খেদমতে হাজির হন, তখন রাসূল সা. আপন চাদর মোবারক তাঁর সম্মানে বিছিয়ে দেন। এরই সাথে সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেন, إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه. 'তোমাদের কাছে কোনো কওমের সম্মানী ব্যক্তি এলে তাঁকে সম্মান দেখাবে'। ইকরামে নিম্নোক্ত মৌলিক চারটি জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখবে। অন্যগুলো এগুলোরই অংশ।

১. কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ।

২. নিজের সম্পদ সাথীদের জন্য ব্যয় করা।

৩. প্রত্যেকের সাথে হাসিখুশি চেহারা নিয়ে সাক্ষাৎ করা।

৪. ব্যবহারে ও লেনদেনে নম্রতা।

এ মূলনীতিগুলো সামনে রেখে যদি ইকরামের মশক করা হয়। আর এরই সাথে যদি অন্তর থেকে আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ এ গুণ হাসিল হবে। ইকরামকারীদের মর্যাদা সবার উপরে। আবার সর্বাধিক আকর্ষণকারী হচ্ছেন ইকরাম করনেওয়ালারা। এ কারণে শত্রু পর্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। পরও আপন হয়ে যায়। وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ 'ভালো ও খারাপ সমান নয়' আয়াতটি ওই ইকরাম শিক্ষা দিতে চায় এবং ইকরামের ফলাফলও বলে দিচ্ছে।

দাওয়াতে ইলমের নম্বরটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ

উম্মত যদি নবী সা. এর ইলমের শিক্ষাদান-পদ্ধতি জেনে নেয়, তাহলে শতভাগ উম্মতের মধ্যে ইলম যিন্দা হয়ে যাবে। আর দাওয়াতের কাজ সঠিকভাবে করতে হলে ইলমকে যিন্দা করতেই হবে। বর্তমান সময়ে ইলম একটি বিশেষ তবকার মধ্যে পাওয়া যায়। আওয়ামের মধ্যে ইলম নেই। এ কারণে দেখা যায় এ তবকা ইলমের উঁচু স্তরে অবস্থান করছে যে, কুরআন শরীফের নিগূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব বর্ণনা করছে। আর অন্য তবকা কালেমা পর্যন্ত জানে না। ফরয ওয়াজিব দূরে থাক তাদের তো মৌলিক আকীদার পর্যন্ত খবর নেই।

ইলমের এ পদ্ধতি আবার যিন্দা হয়ে গেলে, যা সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল, তখন উভয় তবকায় দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠবে। আর সকল মানুষ প্রয়োজন মতো ইলমও হাসিল করে নিতে পারবে। কারণ ইলম হাসিলের ব্যাপারে বর্তমান সময়ের রেওয়াজ বা প্রচলিত পদ্ধতি ও এর নকশা দিল দেমাগে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এ কারণেই তো তাবলীগ ওয়ালাদের উপর অভিযোগ হল, এঁরা ইলম হাসিলের প্রতি না নিজেরা আগ্রহী আর না অন্য লোককে আগ্রহ দেয়।

দ্বিতীয়ত সাধারণ জনগণ যাদের কালেমা ও নামায শেখার প্রয়োজন। যাদের মৌলিক আকীদা জানার প্রয়োজন। যাদের কাছে হারাম হালাল পৌছানোর প্রয়োজন। যাদের পারস্পরিক লেনদেনের বিষয় জানার প্রয়োজন। তাদের কাছে কুরআন হাদীসের এমন সূক্ষ্ম ও তত্ত্বগত বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে, পূর্বোক্ত বিষয়গুলো সহীহ না হলে যা তাদের তেমন কোনো কাজে আসবে না। এ গুলো দ্বারা তাদের তেমন কোনো ফায়দা হবে না। এ কারণেই তো বলা হয়েছে علموا الناس على قدر عقولهم وعلى قدر حاجاتهم 'মানুষের সাথে তাদের বুঝ ও প্রয়োজন অনুসারে কথা বলো'। যে কাজের আগে প্রয়োজন তা আগে জানতে হবে। হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. ইলম অর্জনকে কখনো অস্বীকার করতেন না, তবে এক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি বলতেন। আর তা হল, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের প্রয়োজন মতো ইলম হাসিল করনেওয়ালা হয়ে যায়। যা তার প্রয়োজনকে পূরা করে দেবে। ইলম যেন আনন্দ ফূর্তি ও বিনোদনের মাধ্যম না হয়। রাসূল সা. এর সাহাবীগণ যে পদ্ধতি ও নিয়মে ইলম অর্জন করতেন এ পদ্ধতিতে ইলম অর্জন খুবই উপকারী ও ব্যাপক হওয়ার মাধ্যম হবে। ইলম অর্জনের অন্যান্য পন্থাও উপকারী ঠিক, তবে এ পরিমাণ নয় এবং এগুলোর ব্যাপকতা কম।

যিকিরের নম্বরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ

এ বিষয়টিও শতভাগ উম্মতের মধ্যে ওই তরীকায় আসতে পারে—যে তরীকা নবী সা. এর যুগে ছিল। যে তরীকায় সাহাবায়ে কেরাম আপন ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবি-বাচ্চা, অন্যান কাজকর্ম ও জিহাদে আল্লাহর যিকিরকারী হয়েছিলেন। শতব্যস্ততার মাঝেও তাঁদের মুখে যিকির জারি থাকত। বর্তমান সময়ে যেহেতু ওই সময়ের নকশা বাকি থাকেনি তাই অন্যান্য কাজ এমনভাবে জেকে বসেছে যে, যা অবসর আর অবসর চায়। এতেও অনেক ফায়দা রয়েছে যদিও তা এত ব্যাপক নয় এবং যে কেউ এর উপর চলতে পারে না।

হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. ওই নববি তরীকাকে যিকিরে যিন্দা করতে চাইতেন। যাতে পূরা উম্মতের মধ্যে যিকরুল্লাহর প্রচলন হয়ে যায়। এবং যিকির যেন দ্বীনি ইলম, দুনিয়াবি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সকল কাজকর্মের সাথে সাথে চলতে থাকে। এভাবেই ইলম ও যিকিরের উভয় তবকায় মিল-মহব্বত ও ফায়দা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক হয়ে যায়। কারণ মুসলমানরা উভয় কাজের প্রতি মারাত্মক মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী। মূল তো হল প্রথমের নাম্বার দু'টি অর্থাৎ কালেমা ও নামায। আর অন্যান্য নম্বর হল ওই দু'টি সহীহ-শুদ্ধভাবে আদায় করা ও এগুলোতে হাকিকত পয়দা এবং এগুলো প্রচার ও প্রসার করার জন্য।

সহীহ ও সঠিক দাওয়াতের উপর চলনেওয়ালা হবে ওই ব্যক্তি যে, এ সব কথা ও আলোচনার খেয়াল রেখে উম্মতের সাথে মিলে-মিশে চলবে এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে চলবে। আর এর উদ্দেশ্য যেন না জাগতিক স্বার্থ হাসিল করা হয়, আর না ইযযত-সম্মান লাভ; বরং উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহর কালেমা বুলন্দকরণ ও কুফরকে অপমানিত ও ধ্বংস করা। নিজের সকল মান-সম্মান ও ইযযতকে ওই কাজের জন্য কুরবান করতে হবে। কিন্তু এতেও মারাত্মক খাতরা ও আশঙ্কা এসে হাজির হয় যে, নিজের কোরবানিসমূহ তখন প্রশংসনীয় মনে হতে লাগে। তখন অন্যদের কাছ থেকে ইকরাম ও সম্মান পাওয়ার আশা মনে জাগ্রত হয়ে যায়। অথচ এতে ইকরামের আকাঙ্ক্ষা করাও ঠিক নয়; বরং অন্যদেরকে ইকরাম ও সম্মান করা শিখতে হবে। সাথীরা ইকরাম না করলে মনে এ খেয়ালও আনবে না যে, সে আমার ইকরাম করল না এবং এর কারণে কাজে কোনো ধরনের অলসতাও করবে না। অন্যথায় শয়তান এমন হালতে নিয়ে যাবে যে, সব কাজ বরবাদ হয়ে যাবে।

কখনো মনে এ খেয়াল আনবে না যে, আমি তো আমার সারা যিন্দেগি দাওয়াতের কাজে লাগিয়ে দিলাম। এরপরও আমার কদর ও সম্মান করা হচ্ছে না; বরং সবসময় নিজের ত্রুটির কথা মনে করতে থাকবে যে, হায়! আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। আমি তো জানি না কিয়ামতদিবসে আমার সাথে কী আচরণ করা হবে। আমার এ মেহনত কবুল করা হবে, না তা বেকার যাবে? সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের সহীহ, শুদ্ধ ও সঠিক কোরবানি সত্ত্বেও নেফাকের আশঙ্কা করতেন। এ সব গুণ আমাদের মধ্যে না এলে তখন শুধু শব্দ থাকবে হাকিকত আসবে না। পরীক্ষার সময় মানুষ শব্দাবলি ভুলে যায়। তখন কিন্তু মনের আসল অবস্থা সামনে এসে হাজির হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তোতাকে সারাটি বৎসর কালেমা পড়ানো হল এবং সে প্রত্যেক আগত ব্যক্তির সামনে এটা বলতে থাকল ঠিকই, কিন্তু যখন বিড়াল এসে থাবা দিল তখন কালেমার পরিবর্তে মুখ দিয়ে ঠা ঠা বের হতে থাকল। এ কারণেই প্রত্যেক জিনিসের হাকিকতের ধ্যান করতে থাকবে। এখন আমাদের কথা 'যা কিছু হয় আল্লাহ থেকে হয়, অন্য থেকে কোনো কিছু হয় না'—এটা তোতার বুলির ন্যায়। এটাকে মনে স্থান দিতে হলে মেহনত করতে হবে।

এ কাজে গাশত হচ্ছে মেরুদণ্ডের ন্যায়

এর সম্পর্ক রয়েছে সকল নবী রাসূলের সাথে। রাসূল পাক সা. মক্কা মুকাররামায়, তায়েফে ও হজ্ব মৌসুমে মিনায় গাশত করতেন। কখনো একা কখনো হযরত আব্বাস রাযি.সহ। তখনো কিন্তু তিনি মুসলমান হননি। আবার কখনো আবু বকর রাযি. এর সাথে আর কখনো যায়েদ বিন হারেসা সাথে থাকতেন। রাসূল সা. একা ও ইজতেমায়ি উভয়ভাবে গাশত করেছেন। সূরা ইয়াসীনে তিনজন ব্যক্তির দাওয়াতে যাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। কুরআনে এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মূসা আ. আপন ভাই হারুন আ.-কে নিয়ে দাওয়াত দিতে গিয়েছিলেন।

বর্তমানে তো গাশতের তেমন গুরুত্ব দেখা যায় না। এর গুরুত্ব চোখে পড়ে না। কেবল মসজিদে ওয়ায করা বাকি রয়েছে। এটাও কম নয়। কিন্তু গাশত করে নিয়ে আসলে কথায় যে আছর ও প্রভাব থাকে, তা গাশত ছাড়া কখনো হয় না। সবাই ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত। সবাই এ কথা মনে করে নিয়েছে যে, উম্মতের এ পরিমাণ ঈমান

রয়েছে যে, তারা আমাদের বয়ান শুনে হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব, হুকুক বা অধিকার ও মুআমালা বা লেনদেনের উপর এসে যাবে; অথচ তাদের ঈমান এত কমজোর যে, এগুলো শুনে মেনে নেওয়া মুশকিল। এ কারণেই ওয়ায, বক্তৃতা ও লিখনি বাড়ার সাথে সাথে মানুষের অবস্থারও অবনতি ঘটছে। উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না; বরং দিন দিন খারাপ কাজের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। তাই একথা মনে করবে যে, ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে, এ ঈমান দিয়ে আমল করা মুশকিল। তাই প্রথমে ঈমান বাড়ানোর মেহনত করতে হবে। ঈমান এ পরিমাণ মজবুত হতে হবে যা খাহেশাত বা কুপ্রবৃত্তির উল্টো রাসূল সা. এর সুন্নাতের দিকে টেনে আনে। হাদীসে পাকে এসেছে لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه "তোমরা কেউ তখন পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না; যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে—তা তার অপর ভাইর জন্যও পছন্দ করবে।" এবং এতে রয়েছে رحماء بينهم 'মুমিনদের বেলায় নম্র ও ভদ্র' এর পাঠ পড়া ও শিখার উত্তম সুযোগ। গাশতে আরো রয়েছে ইখলাস ও নিষ্ঠার মশক, বসীরত বা অন্তর্দৃষ্টি হাসিলের প্রশিক্ষণ এবং উম্মতের প্রতি দরদ ও সহমর্মিতা অর্জনের মাধ্যম। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, এটা সকল নবী-রাসূলের সুন্নাত। গাশতে যে পরিমাণ কষ্ট মুজাহাদা করতে হয়—অন্য কোনো আমলে এরকম করতে হয় না। এর দ্বারা যে পরিমাণ ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অর্জিত হয় অন্য কোনো আমল দ্বারা ততটুকু হাসিল হয় না। গাশতের আমল যিন্দা হয়ে গেলে পূরা দ্বীন আবার যিন্দা হয়ে যাবে।

হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর একটি কথা রয়েছে যে,

আমি এ কাজ দ্বারা দু'টি জিনিস চাচ্ছি—

১. পূরা উম্মত জামাত জামাত হয়ে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, দেশে দেশে, অঞ্চলে অঞ্চলে রাসূল সা. কর্তৃক আনীত বিষয়াবলি নিয়ে চলাফেরা করার সুন্নাতকে আবার যিন্দা করে নেয় এবং তা মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরে।

২. সকল মুসলমানের মনে যেন এ জযবা ও আবেগ এসে যায় যে, এ দুনিয়ায় আল্লাহর রাস্তায় জান দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই। গাশত সহীহ তরীকায়, সহীহ নিয়তে, সহীহ জযবাসহ করা হলে তখন মানুষের মধ্যে দ্বীন এভাবে বিস্তার লাভ করবে, যেভাবে বৃষ্টির দ্বারা জমিনে সবুজ-শ্যামল শস্য, ফল ও ফসল উৎপন্ন হয়। দ্বীনি, দুনিয়াবি বা পারিবারিক যে কোনো কাজে মশগুল থাকাবস্থায় গাশত করা যায়। যেমন সাহাবায়ে কেরাম করতেন। তারা সৈন্য পরিচয়ে, দূতের নামে থাকুন না কেন—সর্বাবস্থায় গাশত করতে থাকতেন। গাশত যিন্দা হয়ে গেলে নিজের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে দ্বীন যিন্দা হয়ে যাবে।

বেহুদা ও অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় দ্বীনের রওনক ও আলো থাকে না। এটাও এখন খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে। আল্লাহপাক আমাদেরকে এ সকল কাজ করার তাওফিক দিন এবং তা আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আমীন।

মহিলাদের বিশেষ বয়ান

১. একজন গর্ভধারিণী মহিলার দুই রাকাত নামায, সুস্থ মহিলার আশি রাকাতের সমান।

২. যে মহিলা নিজ সন্তানকে আপন দুধ পান করায়, আল্লাহপাক তাকে দুধের প্রতিটি ফোটার বদলে একটি করে নেকি দেবেন।

৩. স্বামী পেরেশান অবস্থায় ঘরে এলে স্ত্রী তাকে স্বাগত জানিয়ে সান্ত্বনা দিলে আল্লাহপাক এ মহিলাকে অর্ধেক জিহাদের সওয়াব দেবেন।

৪. যে মহিলা বাচ্চার ক্রন্দনের কারণে সারারাত ঘুমায়নি আল্লাহপাক তাকে বিশটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব দেবেন।

৫. স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে রহমতের নজরে তাকালে আল্লাহপাক তাদের উভয়ের প্রতি রহমতের নজরে তাকান।

৬. যে মহিলা স্বামীকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠিয়ে নিজে আদব রক্ষা করে ঘরে থাকবে ওই মহিলা স্বামীর পাঁচশত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং সে সত্তর হাজার ফেরেশতা ও জান্নাতি হুরদের সর্দার হবে। ওই মহিলাকে জান্নাতে গোসল দেওয়ানো হবে এবং সে ইয়াকুতের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আপন স্বামীর অপেক্ষায় থাকবে।

৭. যে মহিলা আপন সন্তানের অসুস্থতার কারণে ঘুমাতে পারেনি এবং সে সন্তনকে আরাম দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আল্লাহপাক তার গুনাহ মাফ করে দেন এবং সে বার বৎসরের কবুল ইবাদতের সওয়াব পাবে।

৮. যে মহিলা গরু বা মহিষের দুধ বিসমিল্লাহ বলে দোহন করে ওই পশু তার জন্য দুআ করতে থাকে।

৯. যে মহিলা বিসমিল্লাহ পড়ে আটার খামির বানায় আল্লাহ তাআলা এ ঘরের রুজিতে বরকত দেন।

১০. যে মহিলা পরপুরুষের দিকে তাকায় আল্লাহ তার উপর লানত দেন। পরনারীর ন্যায় পরপুরুষকেও দেখা হারাম।

১১. যে মহিলা আল্লাহর যিকির করতে করতে ঝাড়ু দেয় আল্লাহ তাকে কাবা ঘর ঝাড়ু দেওয়া পরিমাণ সওয়াব দেন।

১২. তোমার লজ্জা না থাকলে যা ইচ্ছা করতে পারো। বুখারি

১৩. যে মহিলা নামায ও রোযার পাবন্দি করে, সৎ থাকে এবং নিজের স্বামীর তাবেদারী ও আনুগত্য করে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে চাইবে প্রবেশ করতে পারবে। মিশকাত

১৪. দুইজন মানুষের নামায মাথার উপর যায় না অর্থাৎ কবুল হয় না—
এক. ওই ব্যক্তি যে আপন মালিক থেকে পালিয়ে গেছে।
দুই. ওই মহিলা যার উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট ও নারাজ।

১৫. গর্ভবতী মহিলার রাত ইবাদতে ও দিন রোযায় গণ্য হয়।

১৬. কোনো মহিলার বাচ্চা জন্ম হলে তার আমলনামায় সত্তর বৎসরের নামায ও রোযার সওয়াব লেখা হয়। আর বাচ্চা প্রসবকালে যে কষ্ট সহ্য করে এর বিনিময়ে প্রত্যেক রগের ব্যথার বিনিময়ে এক একটি হজ্বের সওয়াব লেখা হয়।

১৭. যে মহিলার বাচ্চা জন্মের চল্লিশ দিনের ভেতর মারা গেছে, তাকে শাহাদতের মর্যাদা দেওয়া হয়।

১৮. রাতে বাচ্চা কাঁদলে মা বদ-দুআ না দিয়ে দুধ পান করালে সে এক বৎসরের নামায ও রোযার সওয়াব পাবে।

১৯. বাচ্চার দুধ পান করার সময় শেষ হয়ে গেলে আসমান থেকে একজন ফেরেশতা এসে ওই মহিলাকে সুসংবাদ দেন যে, হে মহিলা! আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

২০. স্বামী সফর থেকে ফিরে আসার পর স্ত্রী তাকে খানা খাওয়ালে—তবে স্ত্রী যেন ওই সময় কোনো খেয়ানত করেনি— ওই মহিলা ১২ বৎসরের নফল ইবাদতের সওয়াব পাবে।

২১. স্ত্রী স্বামীর না বলার পরও খেদমত করলে সাত তোলা সোনা সদকা করার সওয়াব পাবে। আর স্বামী বলার কারণে খেদমতে করলে সাত তোলা রৌপ্যের সওয়াব পাবে।

২২. স্বামী রাযি-খুশি থাকাবস্থায় স্ত্রী মারা গেলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

২৩. একজন পূণ্যবতী মহিলা সত্তরজন পুরুষের চেয়ে উত্তম।

২৪. নিজের স্ত্রীকে একটি মাসআলা শিক্ষা দিলে ৮০ বছরের ইবাদতের সওয়াব পাবে।

২৫. মহিলারা গয়রে মহরম পুরুষ থেকে পর্দা করবে। পাতলা কাপড় পরিধানকারিণী, মানুষের মধ্যে কামোত্তেজনা সৃষ্টিকারিণী এবং পরপুরুষের দিকে আকাঙ্খাকারিণী মহিলারা অর্থাৎ সেজেগোজে চলাচলকারী মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের ঘ্রাণও পবে না।

কয়েকটি জানার বিষয়

১. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছিলেন বিবি সুমাইয়্যা রাযি.।

২. রাসূল সা. এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন খাদিজা রাযি.।

৩. সবচেয়ে বড় মহিলা মুহাদ্দিসা হলেন হযরত আয়শা রাযি.।

৪. দুনিয়াতে সর্বাধিক কষ্ট সহ্যকারিণী মহিলা হলেন ফেরাউন পত্নী হযরত আসিয়া আ.।

৫. দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসা প্রকাশকারিণী মহিলা হলেন ওই, যে রাসূল সা. এর কবর দেখামাত্র ইন্তেকাল করেন।

ইস্তেকামত বা অটলতার সতেরটি উপায়

মাওলানা সাঈদ আহমদ খান

১. যে তাবলীগের কাজ দিল থেকে করবে, সে অটল থাকতে পারবে।

২. যে দৈনিক দাওয়াত দিতে থাকবে তার আবেগ সৃষ্টি হতে থাকবে। আর যে দাওয়াত দেবে না—তার আবেগ ও উৎসাহ কমতে থাকবে।

৩. যে দাওয়াতের পরিবেশে থাকবে সে অটল থাকতে পারবে। আর যে দাওয়াতের পরিবেশ থেকে দূরে থাকবে সে এ কাজ থেকে ছিটকে পড়বে।

৪. যে এ কাজে ফাকি দেবে, সে একাজ থেকে ছিটকে পড়বে।

৫. যে এ কাজে অন্যের দোষ তালাশ করবে, সে ছিটকে পড়বে। আর যে অন্যের উত্তম গুণের খেয়াল করবে, সে এ কাজে জমে থাকতে পারবে।

৬. আমীরের অনুগত ও পরামর্শের উপর চলনেওয়ালা এ কাজে অটল থাকতে পারবে।

৭. যে বিনয় গ্রহণ করবে সে অটল থাকতে পারবে। আর যে অহঙ্কার নিয়ে চলবে, সে মাহরূম হবে।

৮. কিছু গুনাহ এমন যেগুলোর কারণে এ কাজ থেকে মাহরূম হতে হয়। গিবত, দোষারোপ, কুদৃষ্টি ও শহওত বা কুপ্রবৃত্তি।

৯. যে জামাত তাওবা ইস্তেগফারসহ চলবে অটল থাকতে পারবে।

১০. যে অন্যের ভুল নিজের উপর নেবে সে অটল থাকতে পারবে, আর যে নিজের দোষ অন্যের উপর চাপাবে, সে এ কাজে জমে থাকতে পারবে না।

১১. যে রাসূল সা. এর সাথে মুনাফিকি হিসেবে চলবে, সে উপকৃত হতে পারবে না। এমনকি ঈমান পর্যন্ত নসীব হবে না।

১২. যে অন্যদের ভুল কাজের উত্তম ব্যাখ্যা করতে পারবে, সে এ কাজে জমতে পারবে। আর যে প্রত্যেক কাজের উল্টো ব্যাখ্যা করবে সে জমতে পারবে না।

১৩. যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তাঁর কাছে দুআ করে চলবে সে জমতে পারবে। সবসময় আল্লাহর কাছে অটল থাকার দুআ করতে থাকবে অন্যথায় হেলে যাবে। রাসূল সা. পর্যন্ত অটল থাকার দুআ করতেন। হযরত ইবরাহীম আ. পর্যন্ত এর জন্য দুআ করেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে মূর্তিপূজকদের মূর্তিপূজা থেকে বাঁচাও। অথচ তাঁর কাছ থেকে মূর্তিপূজার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তিনি যখন এ দুআ করেছেন তাহলে আমরা কারা ?

১৪. যে ইখলাসসহ কোরবানি ও ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাঁকে সর্বাবস্থায় অটল রাখবেন। মানুষের পা যেখানে উপড়ে যায় আল্লাহ তখনো তাঁকে উত্তম সন্তুষ্টি নসীব করবেন।

১৫. যে বলবে, আমার দ্বারা হচ্ছে আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নেবেন।

১৬. হযরতজি বলতেন, যে নকল করতে পারে না- সে আসল কাজে জমবে কীভাবে? আমরা তো নকলকারী।

১৭. যে সারা উম্মতের দরদ নিয়ে চলবে তাঁর অন্তরের অবস্থা আল্লাহপাক সারা পৃথিবীতে ঢেলে দেবেন।

মৌলবি ফারুক সাহেবের ওই পাঁচটি কথা, যেগুলো দ্বারা দিল জোড়ে

১. সালাম দ্বারা।

২. ইকরাম দ্বারা।

৩. হাদিয়া দেওয়া দ্বারা।

৪. অনুপস্থিতিতে প্রশংসা দ্বারা ।

৫. নাম উল্লেখ করে দুআ করা দ্বারা।

ভাই হাজি আবদুল ওহহাব সাহেবের পাঁচটি কথা

১. সাথীদের খেদমত করবে।

২. সাথীদের ইকরাম করবে।

৩. সাথীদের ইসলাহ ও সংশোধনের চিন্তায় পড়বে না।

৪. সাথীদেকে উসূল ও নিয়মের উপর চালানোর চিন্তায় পড়বে না।

৫. সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা হল নিজে উসূলের উপর অটল থাকা।

দায়ীর আটটি গুণ

১. মানুষের কষ্ট দেওয়ার উপর ধৈর্য্য ধরা।

২. উম্মতের সাথে মহব্বত ও ভালবাসা থাকা।

৩. নিজের ইসলাহের নিয়তে দাওয়াত দেওয়া।

৪. কামিয়াবিকে আল্লাহর মদদ ও সাহায্য মনে করা।

৫. মানুষ দাওয়াত না মানার কারণে নিরাশ না হওয়া।

৬. জান, মাল ও সময় কোরবানি দেওয়ার আগ্রহ থাকা।

৭. অহঙ্কার ও বড়াইয়ের পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতা থাকা।

৮. প্রত্যেক নেক কাজের শেষে ইস্তেগফার করতে থাকা।

কুরআন হাদীসের আলোকে
চিল্লার প্রমাণ

এক আরব মাওলানা তারিক জামিল সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা চিল্লা কোথায় পেয়েছেন?

তিনি বললেন, ঠিক আছে, আপনি পঁয়তাল্লিশ দিনের জন্য বের হন; তবু বিবাদ করা থেকে, বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকুন।

এটি বিবাদ করার মতো কোনো বিষয় নয়।

তারবিয়াত ও সংশোধনের জন্য সময় দরকার। চিল্লা সময়ের একটি ব্যবস্থাপনা মাত্র। আসল হলো তারবিয়াত। তারবিয়াত ব্যতীত কিছু হয় না। না হলে চিল্লার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

তো আমরা তারবিয়াতের জন্য চিল্লা তথা ৪০ দিন ঠিক করে নিয়েছি।

আরব জিজ্ঞেস করল, চিল্লা কোথায় পেলাম?

আদম আ.এর দেহকাঠামো পড়ে ছিল ৪০ বছর। তারপর আল্লাহ পাক তাতে রূহ দান করেন।

এরপর তাকে ৪০ বছর কাঁদিয়ে তাওবা কবুল করেন।

হযরত ইবরাহীম আ. কে আগুনের কুণ্ডে বসিয়ে রাখেন ৪০ দিন।

হযরত মূসা আ. কে তুর পাহাড়ে বসিয়ে রাখেন ৪০ দিন।

তো ইবরাহীম আ. এর আগুনে এক চিল্লা।

মূসা আ. এর তুর পাহাড়ে এক চিল্লা।

আমরা তিনটিকে একত্রিত করে বলে দিলাম, যাও ভাই তিন চিল্লা।

তাছাড়া হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন, ' যে ব্যক্তি লাগাতার ৪০ দিন তাকবীরে উলার সঙ্গে নামায আদায় করবে, সে জাহান্নাম ও নেফাক থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।'

আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে।'

তো আল্লাহর রাসূল সা. ৪০ বলেছেন, ৫০ বলেননি। তা হলে এর বৈশিষ্ট্য কিছু আছে নিশ্চয়।

আরও আছে।

হযরত উমর রাযি. এর আমলে এক ব্যক্তি জিহাদ থেকে ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কত দিন পরে ফিরেছ?

বলল, এক মাস পর।

হযরত উমর রাযি. বললেন, ৪০ দিন পূরা করলে না কেন?

তো আমাদের এই চিল্লা ভিত্তিহীন নয়।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সা. বলেন, ' যে ব্যক্তি ৪০টি সকাল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে দিয়ে দেবে, আল্লাহ তার অন্তরকে প্রজ্ঞা দ্বারা ভরে দেবেন। এত ভরে দেবেন যে, তা ফোয়ারা হয়ে তার মুখ দ্বারা ফুটতে শুরু করবে।

এও তো চিল্লা।

(এছাড়া মানবসৃষ্টির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আলোচনায় কুরআন ও হাদীসে এসেছে, প্রথম চল্লিশ দিন বীর্য অবস্থায় থাকে এরপর চল্লিশ দিন জমাট বাধা রক্ত অবস্থায় এরপর চল্লিশ দিন গোশতের টুকরো অবস্থায় এরপরে মানুষের আকৃতি প্রদান করা হয়। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি চল্লিশ দিন অন্তর অন্তর পরিবর্তন হয়ে থাকে। তাই বুঝা গেল যে, পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চল্লিশের প্রভাব রয়েছে। এ দ্বারাও চল্লিশ দিনের চিল্লার প্রমাণ মিলে।)

৯৮-১১৬

তাবলীগ জামাতের

সমালোচনা ও জবাব

আমি আশংকাবোধ করয়ী যে, হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবি রাহ. শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানি রাহ. প্রমুখ পূর্বসূরীদের অনেকেই বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে নিজেরাই সমালোচনার শিকার হয়েছেন যে, এরা তাবলীগ বিরোধী। সুতরাং আমার ব্যাপারেও এ ধরনের আশংকা হচ্ছে। কেননা, আমি নিজেও তাবলীগ জামাত ও তাবলীগ জামাতের মুরব্বিদের ভুলত্রুটির সংশোধন করে থাকি; বরং আমার বোকামীই বলুন কিংবা সৎসাহসই বলুন, শ্রদ্ধেয় চাচাজান হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর যুগে তাঁর ব্যাপারেও কোনো প্রকার সমালোচনা করতে সংকোচবোধ করতাম না। তারপর স্নেহাস্পদ মাওলানা ইউসুফ রাহ. ও মাওলানা এনামুল হাসান রাহ. সহ অন্যান্য নতুন-পুরাতন মুরব্বিদের ব্যাপারেও ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করিনি। অনুরূপভাবে মক্কা, মদিনা, পাকিস্তান ও আফ্রিকার বন্ধু-বান্ধব এক কথায় কাউকেই ছাড়িনি। সুতরাং আমার বহু চিঠিতেই সমালোচনা ও অভিযোগ অনুযোগমূলক উক্তি মিলবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।..................

এ মুবারক আন্দোলনকে আমি এ যুগের জন্য অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বের অধিকারী মনে করি। আমি নিজে মাদরাসা ও খানকার সাথে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করি যে, এ গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাদরাসা ও খানকা থেকে অধিক ফলপ্রসূ ও উত্তম।................

তাবলীগ জামাতের

সমালোচনা ও জবাব

লেখক: শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ.

দাওয়াত ও তাবলীগের নামে হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর সুবিশাল আন্দোলনের গোড়া থেকেই এ অধমের কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন, অভিযোগ-অনুযোগ আসা আরম্ভ হয়। আর তখন শরীরও যেহেতু সুস্থ ছিল, তাই প্রতিটি পত্রের জবাব কম বেশি দিয়ে এসেছি।

আমার ধারণায় এ বিষয়ে অন্তত এক হাজার চিঠি লিখেছি। এর মধ্যে দু'একটি ছাড়া প্রায় সবগুলো একই ধরনের চিঠি ছিল। কিন্তু কয়েক বছর যাবত বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে প্রতিটি চিঠির ভিন্ন ভিন্ন জবাব লেখা আমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। তাই ইচ্ছা হল, বহুল প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জবাব পুস্তিকাকারে পাঠকের হাতে তুলে দেব।

তাছাড়া আরেকটি আশংকাবোধ করয়ী যে, হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবি রাহ. শাযখুল ইসলাম সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানি রাহ. প্রমুখ পূর্বসূরীদের অনেকেই বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে নিজেরাই সমালোচনার শিকার হয়েছেন যে, এরা তাবলীগ বিরোধী। সুতরাং আমার ব্যাপারেও এ ধরনের আশংকা হচ্ছে। কেননা, আমি নিজেও তাবলীগ জামাত ও তাবলীগ জামাতের মুরব্বিদের ভুলত্রুটির সংশোধন করে থাকি; বরং আমার বোকামীই বলুন কিংবা সৎসাহসই বলুন, শ্রদ্ধেয় চাচাজান হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর যুগে তাঁর ব্যাপারেও কোনো প্রকার সমালোচনা করতে সংকোচবোধ করতাম না। তারপর স্নেহাস্পদ মাওলানা ইউসুফ রাহ. ও মাওলানা এনামুল হাসান রাহ. সহ অন্যান্য নতুন-পুরাতন মুরব্বিদের ব্যাপারেও ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করিনি। অনুরূপভাবে মক্কা, মদিনা, পাকিস্তান ও আফ্রিকার বন্ধু-বান্ধব এক কথায় কাউকেই ছাড়িনি। সুতরাং আমার বহু চিঠিতেই সমালোচনা ও অভিযোগ অনুযোগমূলক উক্তি মিলবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে তাবলীগ জামাত সম্পর্কে অর্থহীন ও অনির্দিষ্ট কোনো সমালোচনার প্রতি আমি কখনো কর্ণপাত করিনি। কেননা, এগুলো নিছক কথামাত্র। যেমন, দিল্লীর উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অনেকের অভিযোগ, তাঁরা সমালোচনাকারীদের সমালোচনাকে বাতাসের মত উড়িয়ে দেন; কোনই গুরুত্ব দেন না। এ ব্যাপারে আমি

তো তাদের চেয়েও বেশি অগুরুত্ব দিয়ে থাকি। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ হলে, তা যে কোনো বড় ব্যক্তি সম্পর্কেই হোক না কেন, আমি এর প্রতিবাদ করতে এবং সতর্ক করতে কোনো প্রকার ত্রুটি করিনি।

বুখারি শরীফে রয়েছে– হযরত উসামা রাযি. কে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, কতই না ভাল হত যদি আপনি হযরত উসমান রাযি. এর সাথে– এ ফিৎনাগুলো সম্পর্কে যা তাঁর আমলে দেখা দিচ্ছে আলোচনা করতেন। জবাবে হযরত উসামা রাযি. বলেন, তুমি কি বল, তাঁর সাথে আমার সব আলোচনা তোমার কাছেও বলে বেড়াই? নিভৃতে আমার সাথে তাঁর অনেক কথাই হয়ে থাকে। তবে আমি ফিৎনার বন্ধ দরজা খুলে দিতে চাই না।

আমারও আশংকা ছিল যে, আমার কোনো সমালোচনা কিংবা সংশোধনমূলক কোনো পত্রকে কেন্দ্র করে তাবলীগ বিরোধীরা এই অপপ্রচার না করে বসে যে, মাওলানা যাকারিয়া সাহেবও তাবলীগ পছন্দ করতেন না, যা মোটেই ঠিক নয়। কেননা, এ মুবারক আন্দোলনকে আমি এ যুগের জন্য অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বের অধিকারী মনে করি। আমি নিজে মাদরাসা ও খানকার সাথে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করি যে, এ গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাদরাসা ও খানকা থেকে অধিক ফলপ্রসূ ও উত্তম।

তাবলীগ জামাত সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলো নিম্নরূপ :

সমালোচনা-১

জেহাদ সংক্রান্ত হাদীসগুলো তাবলীগ জামাতের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট করা

তাবলীগ জামাতের বিরুদ্ধে সবচে' বড় অভিযোগ এই যে, এরা জিহাদ সংক্রান্ত সকল হাদীস টেনে এনে তাবলীগের সফরের সাথে জুড়ে দেন। আরো মজার কাণ্ড এই যে, এ প্রশ্ন আহলে ইলমদের পক্ষ থেকেই বেশি এসেছে। বুঝে আসে না যে, আহলে ইলম ও ধরনের প্রশ্ন কিভাবে করেন। কেননা, যদিও জেহাদ বলতে যুদ্ধ-বিগ্রহই অধিক প্রচলিত, কিন্তু আভিধানিক অর্থে এবং কুরআন হাদীসের ব্যবহারে জিহাদ শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহের সাথেই নির্দিষ্ট নয়; বরং মূলত জিহাদ অর্থ আল্লাহর দ্বীন যিন্দা করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করা। আর এ চেষ্টার সর্বশেষ ও অনন্যোপায় পথ হল যুদ্ধ-বিগ্রহ। যুদ্ধ-বিগ্রই জিহাদের মূখ্য নয়। তাফসীরে মাযহারিতে- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ 'তোদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে; অথচ তোমরা তা অপছন্দ করো'।

এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, জিহাদ সকল আমল অপেক্ষা উত্তম হওয়ার কারণ হল তা ইসলাম প্রচার ও মানব গোষ্ঠির হেদায়তের একটি কারণ। সুতরাং মুজাহিদের প্রচেষ্টায় যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে, এ মুজাহিদও তাদের যাবতীয় নেক আমলের অংশীদার হবে।

এও মনে রাখতে হবে যে, যাহেরি ও বাতেনি ইলম শিক্ষাদানের ফযীলত এরচে'ও বেশি। কেননা, এর দ্বারাই ইসলামের প্রচার প্রসার বেশি হয়ে থাকে। এবার একটু বুকে হাত রেখে বলুন তো– সম্প্রতি তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে হেদায়েত যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করছে, তা কি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ আছে? এঁদের মেহনতের ওসীলাতেই কি হাজার হাজার বরং লাখো লাখো বে-নামাযি নামাযি বনে যাচ্ছে না? এঁদের প্রচেষ্টাতেই তো আজ শত শত অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে (গীর্জাগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে মসজিদ বানানো হচ্ছে)।

জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিস্তারিত বিশ্লেষণ এ অধমের গ্রহ 'আওজাযুল মাসালেক' ও 'লা-মিউদ্‌দারারির' টীকায় আলোচিত হয়েছে। জিহাদের আভিধানিক অর্থ হল, কষ্ট সহ্য করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলতে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহসহ নফস, শয়তান ও ফাসিক-ফাজিরদের সাথে মুজাহাদা করা সবগুলোকেই বুঝায়। আর কাফিরদের সাথে জিহাদ হাতের সাহায্যে, মুখের সাহায্যে ও অর্থের বিনিময়ে বিভিন্নভাবে হতে পারে। এ সবগুলো অর্থেই কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় জিহাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–المجاهد من جاهد نفسه-'মুজাহিদ ওই যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে'।

(হাদীসটি ইমাম বায়হাকি রাহ. রচিত শি'আবুল ঈমান গ্রন্থের বরাতে মিশকাত শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে)

ইবনে আরাবি তিরমিযি শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সুফিয়ায়ে কেরামের মতে নফসের সাথে জিহাদই হল জিহাদে আকবর তথা বড় জেহাদ। আর পবিত্র কুরআনের আয়াত والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا- 'যারা আমার রাস্তায় চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে আমি তাঁদেরকে অবশ্যই আমার রাস্তাসমূহ দেখিয়ে দেই'। এ এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে- শত্রুর মুকাবালায় যে জিহাদ করে সে প্রকৃত মুজাহিদ নয়; বরং প্রকৃত মুজাহিদ হল, যে ওই দুশমনের সাথে জিহাদ করে- যে দুশমন সর্বদা তার সাথে রয়েছে।

একবার রাসূলুল্লাহ্ সা. এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ইরশাদ করলেন, رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر 'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম।'[1]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এখানে জিহাদে আকবার বলতে তরবারীর যুদ্ধ এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয়।

তাতে এও রয়েছে যে, আল্লামা রাযি রাহ. লিখেছেন- 'সাবিলুল্লাহ' (আল্লাহর পথ) বলতে সকল নেক আমলকেই বোঝায়।

হযরত থানবি রাহ. 'আত্‌তাশাররুফ বি মারিফাতি আহাদিসিত্ তাসাওউফ' গ্রন্থে তাফসীরে রুহুল মাআনি থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত- جاهدوا في الله حق جهاده 'আল্লাহর রাস্তায় ভালোভাবে জিহাদ করো'।

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত জাবির রাযি.-এর একটি রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন যে, একবার নবী করীম সা.-এর কাছে একটি জামাত যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের আগমন অত্যন্ত শুভ। তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে প্রত্যাবর্তন করলে'। এসব রেওয়ায়তে সনদগত কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও প্রথমত ফাযাইলের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়ত বহুল সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এই দুর্বলতা ক্ষমাযোগ্য।

উলামায়ে কেরাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, নামায-রোযা প্রভৃতি ফরয ইবাদত মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে জিহাদ অপেক্ষা উত্তম। কেননা, ঈমান ও নেক আমল প্রতিষ্ঠাই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য।

'লা-মিউদ্‌দারারি'র টীকায় আল্লামা ইবনে আবেদিনের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নিয়মিত যথাসময়ে ফারাইযের আদায় জিহাদ অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এগুলো ফরযে আইন; আর জেহাদ ফরযে কেফায়া। তাছাড়া ঈমান ও নামায প্রতিষ্ঠার জন্যই জিহাদ জায়েয করা হয়েছে (অন্যথায় নিছক

টীকা: ১. হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য 'লা-মিউদ্দারারি'র টীকায় দেখা যেতে পারে।

মারামারি, কাটাকাটি বৈধ হওয়ার কোনো কারণ নেই)। সুতরাং বুঝা গেল, জিহাদ সত্তাগতভাবে নয়; বরং কারণবশত উত্তম। অপরপক্ষে নামায- রোযা ইত্যাদি সত্তাগতভাবেই নেক আমল ও উত্তম। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নামায প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টাই করা হবে, তা উত্তম জিহাদ বলে পরিগণিত হবে। ইমাম বুখারি রাহ. জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে পায়ে হেটে যাওয়ার ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু আব্বাস রাযি. এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যাতে বলা হয়েছে- من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار। 'আল্লাহর পথে যার পা দু'টি ধূলিধূসরিত হবে, আল্লাহ পাক জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দিবেন'।

একটু ইনসাফের সাথে বলুন তো; ইমাম বুখারি রাহ. যদি এই হাদীসখানা জুমুআর নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে টেনে আনতে পানে, তাহলে তাবলীগি ভাইদের আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে আল্লাহর পথে ঘুরাফেরার ফযীলত প্রসঙ্গে এ হাদীস পেশ করাতে অপরাধটা কোথায়?

হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. ইরশাদ করেন, তাবলীগি সফরে যুদ্ধ-বিগ্রহের সফরের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং এ সফরেও যুদ্ধ সফরের মতই পূর্ণ সওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়। এ সফরে যুদ্ধ না থাকলেও জিহাদরে একটি অংশ অবশ্যই রয়েছে, যা কোনো কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ অপেক্ষা কম হলেও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ অপেক্ষা উর্ধ্বে। যেমন, যুদ্ধের সময় রাগ দমন করতে হয়, এখানেও একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাগ-ক্রোধ দমন করতে হয় এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাদের খোশামোদ, তোষামোদ করতে হয়। এরচে' অপদস্থতা আর কি হতে পারে?

'জিহাদে গোস্সা বা ক্রোধ দমন করতে হয়' হযরত দেহলবি রাহ. এর এ বক্তব্যটি বুখারি শরীফে হযরত আবু মূসা আশআরি রাযি. কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়ত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি এসে নবী করীম সা.কে প্রশ্ন করল, অনেকে গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। আর অনেকে বল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে লড়াই করে (এদের কার যুদ্ধ আল্লাহর জন্য বলে গণ্য হবে?)। নবী করীম সা. এরশাদ করলেন, যে জিহাদ একমাত্র আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে হয়ে থাকে, সেটাই প্রকৃত 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'।

হাফিয ইবনে হাজার রাহ. বলেন, 'আল্লাহর কালিমা' অর্থ ইসলামের দিকে আহবান।[১]

টীকা: ১. হাফিয ইবনে হাজার রাহ. আরো বলেন, আলোচ্য হাদীসে যেসব কারণে মানুষ জিহাদ করে থাকে বলে উল্লেখ হয়েছে তার মধ্যে 'রিয়া' (লোক দেখানো) ও প্রসিদ্ধি অর্জনের কথাও বলা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় (সাম্প্রদায়িকতার জন্য)ও এসেছে। আর এক রেওয়ায়েতে حمية، غضبا (রাগের বশবর্তী হয়ে) এভাবে সবগুলো রেওয়ায়তকে একত্রিত করলে মোট পাঁচটি উদ্দেশ্য হয়।

স্বয়ং নবী করীম সা. যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক এমন বিভিন্ন আমলকে জেহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন, যা আলিম সম্প্রদায়ের অজানা নেই। যেমন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ইসলামি সীমান্তে রাত্রি জাগরণ দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তদপেক্ষা উত্তম। আর বলা বাহুল্য যে, সীমান্তে অবস্থান ইসলামের হেফাযতের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

নবী করীম সা. আরো ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো গাজী (ইসলামি যুদ্ধে গমনকারী)-কে তার প্রয়োজনীয় সামান যুগিয়ে সহযোগিতা করবে, সেও গাজী বলে গণ্য হবে। আর যে তার অবর্তমানে পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নিবে, সেও গাজী বলে গণ্য হবে।

নবী করীম সা. একটি সেনাবাহিনী প্রেরণকালে তাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের প্রত্যেক দু'জনের একজন যুদ্ধে বের হবে (অপরজন তার পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নিবে) এতে উভয় সমান সওয়াবের অধিকারী হবে।

বলাবাহুল্য, এসব সেনাবাহিনী নিছক মারামারি কাটাকাটির জন্য প্রেরণ করা হত না। ঈমানের দাওয়াতই মুখ্য উদ্দেশ্য হত। যেমন বুখারি শরীফে হযরত আলী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ এক রেওয়ায়তে বলা হয়েছে, নবী করীম সা. যখন হযরত আলী রাযি.কে ঝাণ্ডা হাতে দিয়ে খায়বর বিজয়ের জন্য প্রেরণ করলেন, হযরত আলী রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসূল! গিয়েই কি তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিব, যাতে তারা মুসলমান হয়ে যায়? ইরশাদ করলেন, কস্মিনকালেও নয়; বরং সেখানে গিয়ে অত্যন্ত শান্ত ভাবে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তোমার প্রচেষ্টায় একজন লোকও যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে তা তোমার (গনীমতের) অনেকগুলো লাল উট অপেক্ষাও উত্তম। আর যদি তারা অস্বীকার করে, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে 'কর' আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ কর। এতে যদি তারা সম্মত না হয়, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর।

এছাড়াও বিভিন্ন রেওয়ায়ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত জিহাদও নিছক যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়; বরং এতেও ঈমানের প্রতি আহবান ও আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা উদ্দেশ্য।

মাওলানা ইউসুফ রাহ. নাটোরায় উলামায়ে কেরামের বিশেষ এক বয়ানে বলেন, নবী করীম সা. বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে যেসব প্রতিনিধি দল ও সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন, সবগুলো দাওয়াতের উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছিলেন।

নবী করীম সা. এর জিহাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ২৩টি, আর এক রেওয়ায়ত মতে ৩৯টি।[১]

টীকা: ১. এখানে সংখ্যা লিখতে গিয়ে কাতিবের ভুল হয়ে গিয়েছে। সঠিক সংখ্যা হবে ১৯ আর ২৭।

এর মধ্যে নয়টি সম্পর্কে লিখা হয়েছে [illegible] 'যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছেন' অবশিষ্ট সব কয়টির ব্যাপারে লিখা হয়েছে যে, দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। সাওয়ানেহে ইউসুফি আমিমি

সত্যি আশ্চর্য হয় যে, উলামায়ে কেরাম কি করে 'ফী সাবিলিল্লাহ' শব্দটিকে যুদ্ধের সাথে নির্দিষ্ট করেন, অথচ কুরআন ও হাদীসে এর ব্যাপকতার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন লক্ষ্য করুন- পবিত্র কুরআনের আয়াত إنما الصدقات للفقراء والمساكين এতে 'ফী সাবিলিল্লাহ'-র ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আওজাযুল মাসালেকের তৃতীয় খণ্ডে এর বিশদ আলোচনা রয়েছে।

যেমন, আল্লামা রাযি রাহ. এর মত হল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে জিহাদ করা। ইমাম মালিক প্রমুখ একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এর মত হল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সকল নেক আমল। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রচেষ্টাই এর অন্তর্ভুক্ত।

মিশকাত শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত- একবার জনৈক সাহাবী এসে নবী করীম সা. এর কাছে জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সাহাবী আরয করলেন, জি হ্যাঁ, জীবিত আছেন। ইরশাদ করলেন, তবে তাঁদের মধ্যে জিহাদ করো। অর্থাৎ তাঁদের খেদমত করো। লক্ষ্য করুন, এখানে নবী করীম সা. পিতা-মাতার খেদমতকেও জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মিশকাত শরীফে হযরত খুরায়েম বিন ফাতিক রাযি. কর্তৃক বর্ণিত যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি কোনো কিছু খরচ করে, তা বৃদ্ধি পেয়ে সাত শ' গুণে পরিণত হয়।

মোটকথা, এসব রেওয়ায়ত থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, আল্লাহর রাস্তা বলতে শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহই বুঝায় না। তাহলে তাবলীগি সফরে খরচ করার ফযীলত প্রসঙ্গে এ হাদীসগুলো পেশ করাতে অপরাধটা কি হল? অনুরূপভাবে আরও একটি হাদীসে হযরত আলী, আবু দারদা, আবু হুরায়রাহ, আবু উমামাহ, আবদুল্লাহ বিন উমর,জাবির বিন আবদুল্লাহ ও ইমরান বিন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন প্রমুখ থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বাড়িতে বসে থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ পাঠিয়ে দিবে, সে প্রতিটি দিরহামের পরিবর্তে সাত শ' দিরহাম লাভ করবে। আর যে স্বয়ং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়ে খরচ করবে, সে সাত লক্ষ দিরহামের সওয়াব লাভ করবে। কোনো সন্দেহ নেই যে, তাবলীগি সফর এবং মাদরাসার চাঁদা এর অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীরে মাযহারিতে مثل الذين ينفقون في سبيل الله 'যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাদের উপমা হচ্ছে.....' এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। الجهاد او غير ذلك من ابواب الخير জিহাদ ও অন্যান্য নেক আমল।

অনুরূপভাবে–الذين احصروا في سبيل الله 'যারা নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় আটকিয়ে রাখে...'এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে في تحصيل العلوم الظاهرة অর্থাৎ সাবীলুল্লাহ অর্থ যাহেরি ও বাতেনি ইলম অর্জন।

মিশকাত শরীফে তিরমিযি ও দারিমির সূত্রে হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য ঘর থেকে বের হবে, সে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় আছে বলেই গণ্য হবে।

মিশকাতের টীকায় লিখা রয়েছে, 'অর্থাৎ যে ইলম অন্বেষণের জন্য বের হয়, সে জিহাদে বের হওয়ার সওয়াব পায়।' কেননা, তালিবুল ইলমও মুজাহিদের ন্যায় দ্বীন যিন্দা করা এবং শয়তানকে অপদস্থ করার জন্য সাধনা করে এবং বিভিন্ন দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব কিছু তাবলীগের সফরেও পাওয়া যায়।

'এতেদাল' গ্রন্থেও এ ধরনের রেওয়ায়ত প্রচুর পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, এক রেওয়ায়তে বলা হয়েছে, উত্তম জিহাদ হল, যালিম বাদশাহর সামনে হক কথা বলা। আর যালিম বাদশাহ কাফির হওয়া আবশ্যক নয়, বরং যালিম বাদশাহ মুসলমান হলেও তার সামনে হক কথা বলা এ হাদীসের আওতাভূক্ত হবে। তবে প্রধান শর্ত হল, এসব চেষ্টা-সাধনা একমাত্র আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে হতে হবে। যেমন ইতোপূর্বেও বলা হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, প্রকৃত জিহাদ হল, যা একমাত্র আল্লাহ পাকের নাম বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে করা হয়। 'এতেদাল' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

১৩২৮ হিজরি সালে মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার ছাত্রাবাস নির্মাণকালে চাঁদার আবেদন করে হযরত থানবি রাহ. এর লিখা শায়খুল হিন্দ রাহ. ও শাহ আব্দুর রহীম রাহ.-এর সত্যায়িত একটি পত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'আমি এ বিষয়ে একমত যে, মাদরাসার ছাত্রাবাস এই মুহূর্তে 'বাকিয়াতে সালিহাত' অর্থাৎ সদকায়ে জারিয়ার অন্যতম একটি খাত। সহীহ হাদীসে মৃত্যুর পর যেসব আমলের সওয়াব বরাবর জারী থাকে বলে বলা হয়েছে। সেসব আমলের মধ্যে মুসাফিরের জন্য ঘর নির্মাণ করাও উল্লেখ রয়েছে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তালিবুল ইলমগণও নিঃসন্দেহে মুসাফির; বরং উত্তমতম মুসাফির। কেননা, এরা আল্লাহর রাস্তার মেহমান। সুতরাং সাধারণ মুসাফির এর সাহায্যই যদি এতটুকু

ফযীলতপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর রাস্তার মেহমানদের খেদমতের ফযীলত কতটুকু হবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আল্লাহর রাস্তার সকল খাতে দান করা সবচে' বেশি ফযীলতের কাজ। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই মুহূর্তে ছাত্রাবাস নির্মাণ সর্বোত্তম 'বাকিয়াতে সালিহাত'। আশা করি সকল মুসলমান ভাই, সাধ্যানুযায়ী এ সুযোগকে হাতছাড়া করবেন না এবং কম-বেশি অবশ্যই এতে অংশগ্রহণ করবেন। ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্‌তাবায়াল হুদা। - বান্দা আশরাফ আলী থানবি

সত্যায়ন-

নিঃসন্দেহে হযরত আশরাফ আলী থানবি যা কিছু লিখেছেন, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্গত।

---- বান্দা আবদুর রহীম (উফিয়া আনহু)

সত্যায়ন-

মাওলানা আশরাফ আলী থানবি যা কিছু লিখেছেন, তা সত্য ও নির্ভুল।

বান্দা মাহমুদ (উফিয়া আনহু)

এই দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াকে শুধু প্রচলিত জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করেন, তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া যে, 'ফী সাবীলিল্লাহ' শুধু প্রচলিত জিহাদের মধ্যে সীমিত নয়। তাফসীরে মাযহারিতে قل قتال فيه এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে سبيل الله অর্থ الإسلام ইসলাম ও আনুগত্য লিখেছেন। এ ছাড়াও উক্ত তাফসীর গ্রন্থে অসংখ্য জায়গায় আল্লাহর রাস্তা বলতে 'আল্লাহর আনুগত্য করা' বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বাধা দানকারীদের সাথে সামর্থ্য থাকলে এবং কোনো ফিৎনার আশংকা না থাকলে কঠোরতা করতে কোনো ক্ষতি নেই।

আমার সবচে' বেশি আশ্চর্য হয়, উপরোক্ত তিন বুযুর্গের অনুসারীদের মুখ থেকে যখন তাবলীগ জামাতের লোকদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনি যে, 'এরা আল্লাহর রাস্তার হাদীসগুলো তাবলীগে সময় লাগানোর সাথে এনে জুড়ে দেন। অথচ আল্লাহর রাস্তা অর্থ শুধু জিহাদ'।

এই অধমের দৃষ্টিতে আল্লাহর রাস্তার ফযীলত সংক্রান্ত সকল আয়াত ও হাদীসের সাথে প্রচলিত তাবলীগের সফরকেও অন্তর্ভূক্ত করে নেয়াতে আপত্তিকর কিছু নেই এবং আমার এই ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে কোনো মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরের উক্তিতেই আল্লাহর রাস্তা শব্দটি শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত বলে পাইনি। তাই তাবলীগি ভাইদের প্রচলিত তাবলীগে সময় লাগানোর ফযীলত বয়ান প্রসঙ্গে এসব আয়াত ও হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করা অসঙ্গত নয়।

এই বিষয়টি যৌবনকালে অসংখ্য পত্রের জবাবে লিখেছি।

সমালোচনা- ২

তাবলীগ জামাতের প্রচলিত পদ্ধতি

এই প্রসঙ্গেও আমার কাছে বহু পত্র এসেছে যে, নবী করীম সা. এর যুগে এভাবে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে জামাত প্রেরণের প্রচলন ছিল না। তখন জামাত কাফিরদের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হতো। সুতরাং এ পদ্ধতি বিদআত বৈ কিছু নয়। এ প্রশ্নেরও অসংখ্য জবাব আমি লিখেছি। এ প্রশ্নটি আলিমদের মুখে শুনলে আমার খুব আশ্চর্য হয়। এ কথা কারো অজানা নেই যে, 'আমর বিল মা'রুফ নাহি আনিল মুনকার' অবশ্য পালনীয় একটি বিষয়। তাছাড়া ইতোপূর্বের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে, দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে যে কোনো প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভূক্ত। এরপর এ উক্তি করা, 'এ পদ্ধতি নবী করীম সা. এর যুগে ছিল না' মোটেই ঠিক নয়। যেমন, পরবর্তী আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাবে।

যদি মেনেও নেয়া হয় যে, নবী করীম সা. এর যুগে এ প্রচলন ছিল না, তবুও এ কথা স্বীকৃত যে, শরীয়তের কোনো নির্দেশ পালনের জায়েয মাধ্যমগুলোও নির্দেশের আওতাভূক্ত। যেমন ধরুন, বর্তমান মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতি ঠিক এভাবে নবী করীম সা.এর যুগে বিদ্যমান ছিল কি? অনুরূপভাবে নবী করীম সা. এর যুগে তোপ কামানোর যুদ্ধ ছিল না বলে এগুলোকে বিদআত বলে দিয়ে কাফিরদের জঙ্গীবিমান আর রাসায়ণিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার মত বোকামী কি কেউ করবে?

উপরন্তু, এ কথা মোটেই ঠিক নয় যে, নবী করীম সা. এর যুগে মুসলমানদের জন্য এভাবে জামাত প্রেরণের প্রচলন ছিল না। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা ইউসুফ রাহ. প্রণীত 'হায়াতে সাহাবা' গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অধীনে একাধিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নবী করীম সা. এর যুগেও মুসলিম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বিভিন্ন জামাত প্রেরণ করা হতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু'একটি ঘটনা উল্লেখ কর়য়ী।

হযরত আসিম বিন উমর রাযি. হতে বর্ণিত। আমল ও কারাহ গোত্রের কতেক লোকের অনুরোধে নবী করীম সা. সেখানকার মুসলমনাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য ছয়জনের একটি জামাত প্রেরণ করেছিলেন।

হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি. এরশাদ করেন যে, প্রিয়নবী সা. হযরত মুআয ও আবু মূসা রাযি.কে ইয়ামন প্রদেশের লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. বলেন, একবার পেয়ারা হাবীব সা. আমাকে কায়েস গোত্রীয় এক সম্প্রদায়কে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে আমি তাদেরকে জংলী উটের মত দেখতে পেলাম। উট আর ছাগল ছাড়া তারা যেন আর কিছুই বুঝে না। আমি নবী করীম সা. এর কাছে ফিরে এসে তাদের এ দুরবস্থার কথা জানালাম। তিনি ইরশাদ করলেন, আম্মার! এরচেয়েও আশ্চর্যের কথা শুনবে কি? তারা হল এমন সম্প্রদায়, যারা দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও উদাসীন থাকবে। যা হোক এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনা হায়াতে সাহাবা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

আর এ কথা স্পষ্ট যে, কাফিরদের কাছেও জামাত তাদের হেদায়তের জন্যই প্রেরণ করা হত। আর এও জানা কথা যে, অধুনা মুসলিম সম্প্রদায় দ্বীন ও হেদায়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুফরির পর্যায়ে; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর চেয়েও অধম হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে হেদায়তের দিকে আহবান করারও নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত ইলয়াস রাহ. এর মালফূযাতে তাঁর একটি ইরশাদ উল্লেখিত যে, নবী করীম সা. এর হিজরতপূর্ব দাওয়াতের আমল অর্থাৎ, 'লোকদের দুয়ারে দুয়ারে যাওয়া' মদিনা পৌঁছার পর অনিবার্য কারণে অব্যাহত থাকেনি; বরং সেখানে গিয়ে তিনি একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু এটি কখন হয়েছিল? যখন মক্কি জীবনের এ দাওয়াতের আমল সামলে নেয়ার মত এবং তা সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার মত এক বিরাট জামাত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন পরিস্থিতির দাবী ছিল যে, তিনি একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে এ কাজকে আঞ্জাম দেবেন এবং অন্যদের দ্বারা কাজ নিবেন। আর এর ভিত্তিতেই হযরত উমর রাযি. এর জন্য মদিনায় অবস্থান করা তখনই সঙ্গত ছিল, যখন রোম ও ইরানে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য হাজার হাজার মর্দে মুজাহিদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন পরিস্থিতির দাবী ছিল যে, একজন শাসক মারকাযে বসে এ হক্বের দাওয়াত ও আল্লাহর পথে জিহাদের পূর্ণ বিষয়টি পরিচালনা করবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি রাহ. এর ভাগ্নে হযরত মাওলানা জাফর আহমদ থানবি রাহ. হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর শেষ বয়সে তাঁর ইয়াদতে (অসুস্থতার সময় খোঁজ খবর নিতে) গেলেন। ইতোপূর্বে তিনি তাঁর সাথে নেযামুদ্দিনে এক চিল্লা দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. তাকে সে অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে বললেন, আপনার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ আছে কি? এ কথার উত্তরে তিনি হযরতের মৃত্যু পর্যন্ত নেযামদুদ্দিনেই অবস্থান করেন। হযরতের তখন কঠিন অসুস্থতার কারণে একাধারে দীর্ঘ সময় কথা বলা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল।

একবার হযরত বললেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইসলামের প্রথম যুগে যখন দ্বীন ছিল অত্যন্ত দুর্বল, দুনিয়া ছিল শক্তিশালী। তখন অনাগ্রহী লোকদের ঘরে ও মজলিশে গিয়ে তাদের দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। তাদের পক্ষ থেকে আহবানের অপেক্ষা

করতেন না। অনেক সময় সাহাবায়ে কেরামকে নিজ থেকেই তাবলীগের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতেন। তখনকার মত এখনো গোটা সমাজে ঈমান ও আমলের দৈন্যতা বিরাজ করছে। সুতরাং আমাদেরও অনাগ্রহী লোকদের কাছে অনুরূপভাবে মুলহিদ ও ফাসিকদের সমাবেশে গিয়ে হক কথা বুলন্দ করতে হবে (এ কথা বলার পর মাওলানার পীড়া বেড়ে গেলে আর কথা বলতে পারছিলেন না)। তখন মাওলানা জাফর আহমদকে লক্ষ্য করে বললেন, মাওলানা! আপনি আমার কাছে বিলম্বে পৌছেছেন। এখন তো বিস্তারিত কিছু বলাও আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। যা হোক যা কিছু বললাম এতটুকুই গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করুন। মালফূযাতে দেহলবি

বস্তুত, হাদীস ও সীরাতশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অভাবেই মানুষ এ ধরনের উক্তি করে থাকে। অন্যথায় যেমন এই কেবল বলে এসেছি যে, হায়াতে সাহাবায় এ জাতীয় বহু ঘটনা রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে রাসূলল্লাহ সা. এর যুগেও মুসলমানদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য জামাত প্রেরণ করা হত। আবদে কায়েসের প্রতিনিধি দলের ঘটনা তো সকল হাদীস গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ।

ঘটনার বিবরণ হল, তারা এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ও আপনার মাঝে 'মুযার' গোত্র অন্তরায় হয়ে আছে। সুতরাং আমরা একমাত্র পবিত্র মাসগুলোতেই আপনার কাছে আসতে পারি। তাই আপনি আমাদের ঈমান সংক্রান্ত এমন কিছু বিষয় বলে দিন, যার উপর আমল করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এবং ফিরে গিয়ে আমাদের সম্প্রদায়কেও জানিয়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ করলেন। আর চারটি বিষয় থেকে বারণ করলেন। যার বিস্তারিত বিবরণ ৬নং প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে আসবে।

মুসনাদে তায়ালিসির বর্ণনায় এই ঘটনাটিতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করলেন, তোমরা গিয়ে তোমাদের সম্প্রদায়কে এসব বিষয়ে দাওয়াত দিবে। হায়াতুস সাহাবা

হায়াতুস সাহাবাতেই মুসতাদরাকে হাকিমের বরাতে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলকামাহ বিন হারিছ বলেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের সাত ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে? আমরা আরয করলাম, আমরা মুমিন। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, সব বিষয়ের হাকিকত থাকে। বলত, তোমাদের ঈমানের হাকিকত কি? আমরা আরয করলাম, পনেরটি জিনিস, যার পাঁচটি আপনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আর পাঁচটি আপনার দূতের মাধ্যমে পেয়েছি।

হাদীসটি সুদীর্ঘ, তবে এখানে আমার এতটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, রাসূলুল্লাহ সা. লোক মারফত অনেক সময় বিভিন্ন নির্দেশ প্রেরণ করতেন।

বিখ্যাত ইতিহাস ও সীরাত বিশারদ মাওলানা সায়্যিদ সুলাইমান নদবি রাহ. কর্তৃক প্রণীত সাওয়ানেহে দেহলবির ভূমিকা থেকে কিছু অংশ হযরত সায়্যিদ সাহেবের আলোচনা প্রসঙ্গে সামনে আসছে। এতে তিনি লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবনের দাওয়াতের উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলোর একটি হল, 'আরয' অর্থাৎ কারো আগমনের অপেক্ষা না করে তিনি এবং তাঁর অন্যান্য দায়ীরা নিজেই লোকদের কাছে পৌছে যেতেন। এমনকি অনেক সময় লোকদের বাড়ী বাড়ী পর্যন্ত হকের দাওয়াত নিয়ে পৌছে যেতেন। (এ আলোচনা বেশ দীর্ঘ যা সামনে আসছে)।

এরপর তিনি বলেন, এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, দায়ী এবং মুবাল্লিগের জন্য আবশ্যক, নিজেই লোকদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে হকের দাওয়াত পৌছানো। মুকাদ্দামা সাওয়ানেহে হযরত দেহলবি

একবার দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতী মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে তো দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে কাফিরদের কাছে যাওয়া হত। এখনকার মত এভাবে মুসলমানদের কাছে জামাত যাওয়ার কোনো প্রমাণ কি হাদীস শরীফে আছে? থাকলে কিতাবের হাওয়ালাসহ লিখুন। জবাবে মুফতী সাহেব লিখেছেন, ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কুফা ও 'কারকীসিয়া' গমন করেছেন। হযরত ওমর রাযি. হযরত মাকিল বিন ইয়াসার ও হযরত আবদল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল রাযি. প্রমুখের এক জামাত সিরিয়ায় প্রেরণ করেছেন। এসব জামাত মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করেই প্রেরিত হয়েছিল। ইযালাতুল খাফা

বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মুফতী সাহেব রচিত 'কিয়া তাবলীগি কাম জরুরি হাঁয়?' দেখা যেতে পারে।

সমালোচনা-৩

মাদরাসা ও খানকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার

এ প্রশ্ন বেশ শোনা যায় যে, তাবলীগ জামাতে মাদরাসা ও খানকাকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রচার করা হয়। আমার ধারনায় এ প্রশ্নের মূল উৎস তাবলীগ জামাত সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা চিত্তের অনুদারতা। অন্যথায় তাবলীগ জামাতের মূল ছয়টি উসূলের একটি অন্যতম উসূল হল ইলম ও যিকির। তা ছাড়া এ জামাতের উদ্যোক্তা হযরত ইলয়াস রাহ. এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাওলানা ইউসুফ রাহ. এ বিষয়ের প্রতি যতটা গুরুত্বারোপ করতেন, আর কোনো বিষয়ের প্রতি এরূপ করতেন বলে আমার জানা নেই। হযরত দেহলবি রাহ.-এর বক্তব্য তো সুপ্রসিদ্ধ- যা তিনি প্রায় বলতেন যে, আমার আন্দোলনের জন্য ইলম ও যিকির দুটি ডানা তুল্য; এর একটি ভেঙ্গে গেলে পাখির জন্য উড়া মুশকিল।

এ সমালোচকরা যদি হযরত দেহলবি রাহ. তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হযরত মাওলানা ইউসুফ রাহ. এর জীবনী ও তাঁদের মালফূযাত দেখার শ্রমটুকু স্বীকার করতেন, তাহলে হয়ত তাদের কলম ও কালাম থেকে এ ধরনের উক্তি বের হত না। হযরত দেহলবি রাহ. এর মালফূযাতে রয়েছে-

১. হযরত থানবি রাহ. এর ভাগ্নে হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানি রাহ. তাঁর নেযামুদ্দিন অবস্থানকালে হযরত দেহলবি রাহ. এর যে মালফূযাত লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা হযরতের মালফূযাতেও সংকলিত হয়েছে; তাতে তিনি একবার বলেন, আমার এ আন্দোলনে ইলম ও যিকিরের গুরুত্ব অনেক বেশি। ইলম ছাড়া না আমল হতে পারে আর না আমলের পরিচয় লাভ হতে পারে। আর যিকির ছাড়া ইলমের নূর হাসিল হতে পারে না; বরং যিকির ছাড়া ইলম অন্ধকার বৈ কিছুই নয়। (হযরত মাওলানা যাফর আহমদ রাহ. বলেন,) আমি বললাম, হযরত! স্বয়ং তাবলীগই তো একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। সুতরাং তাবলীগ করতে গিয়ে ইলমের পরিমাণ যদি কিছুটা কমে যায়, তবে তার দৃষ্টান্ত তো এরূপ যেমন, হযরত সায়্যিদ সাহেব বেরলবি রাহ. যখন জিহাদের প্রস্তুতি নিলেন, তখন তিনি তাঁর কর্মীদের যিকির আযকারের পরিবর্তে যুদ্ধের প্রশিক্ষণে ব্যস্ত করে দিলেন। এতে অনেকে আপত্তি তুলল যে, হযরত এ সময় পূর্বের ন্যায় নূর পরিলক্ষিত হচ্ছে না। হযরত বেরলবি রাহ. জবাব দিলেন, হ্যাঁ। এখন যিকিরের নূর নেই ঠিকই; কিন্তু জিহাদের নূর অবশ্যই রয়েছে। আর এই মুহূর্তে এরই তীব্র প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত দেহলবি রাহ. বললেন, এরপরও আমার ইলম ও যিকিরের দৈন্যতার কারণে অস্থিরতা অনুভব হচ্ছে। আর এ দৈন্যতার কারণ হল, এখন পর্যন্ত আহলে

ইলম ও আহলে যিকির এতে অংশগ্রহণ করছেন না। তারা যদি এ কাজ সামলে নিতেন তাহলে এ ঘাটতি পূরণ হয়ে যেত। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ জামাতে আহলে ইলম ও আহলে যিকিরের সংখ্যা অনেক কম।

ব্যাখ্যা : এখন পর্যন্ত যেসব জামাত বাইরে পাঠানো হয়, এতে আহলে ইলম ও আহলে যিকিরের সংখ্যা নেই বললেই চলে। যার কারণে হযরত অস্থির ছিলেন। আহলে ইলম ও আহলে যিকির যদি এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করতেন, তা হলে কতই না ভাল হত।

অবশ্য আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে মারকাযে আহলে ইলম ও আহলে নিসবত (আল্লাহওয়ালা) রয়েছেন। কিন্তু এঁদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এঁরা যদি মারকায ছেড়ে বাইরে চলে যান, তাহলে মারকায সামলানোর লোক থাকে না। মালফূযাত

২. একদিন ফজরের পর নেযামুদ্দিনের মসজিদে পুরাতন সাথীদের বিশাল এক মজমা ছিল। মাওলানা শারীরিকভাবে তখন এত দুর্বল ছিলেন যে, শুয় শুয়ে উচ্চস্বরে কিছু বলার মত সামর্থ ছিল না। তাই একজন বিশেষ খাদেমকে তলব করে তার মাধ্যমে পূরা মজমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের এ নকল-হরকত, চেষ্টা-সাধনা বিফল যাবে, যদি আপনারা ইলম ও যিকিরের প্রতি পূর্ণভাবে মনোনিবেশ না করেন; বরং এ দু'টি বিষয়ে অবহেলা করলে এ সকল সাধনা ফিৎনা ও গোমরাহীতে পরিণত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা রয়েছে।

ইলমে দ্বীন ছাড়া ইসলাম ও ঈমান নিছক নাম ও আনুষ্ঠানিকতা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহর যিকির ছাড়া ইলম নিরেট অন্ধকার। অনুরূপভাবে ইলমে দ্বীন ছাড়া প্রচুর পরিমাণে যিকিরেও মারাত্মক আশঙ্কা রয়েছে।

মোটকথা, যিকিরের মাধ্যমে ইলমে নূর আসে, আর ইলমে দ্বীন ছাড়া যিকিরের প্রকৃত বরকত ও ফল লাভ হয় না; বরং অনেক সময় এধরনের জাহেল সুফিদেরকে শয়তান নিজের হাতিয়ার বানিয়ে নেয়। সুতরাং এ কাজের সাথে ইলম ও যিকিরের গুরুত্বের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়; বরং এ ব্যাপারে সর্বদা যত্নবান থাকা উচিত। অন্যথায় তাবলীগের আন্দোলন নিছক তামাশার আকার ধারণ করবে এবং আল্লাহ না করুন, আপনাদের মারাত্মক রকমের ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে।

৩. একবার তিনি ইরশাদ করেন, আমি প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের যিকিরের তালীম দিয়ে থাকি। (তারপর তিনি কিছু ওযায়েফের আলোচনা করে বললেন,) যিকির ছাড়া ইলম অন্ধকার বৈ আর কিছুই নয়। আর ইলম ছাড়া যিকির অসংখ্য ফিৎনার দরজা।

৪. একবার ইরশাদ করেন, দু'টি বিষয়ে আমি বেশ চিন্তিত। সুতরাং এ দুটি বিষয়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। একটি হল যিকির, যে ব্যাপারে আমার জামাতে বেশ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে যিকির শিক্ষা দেয়া উচিত। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, বিত্তশালীদের যাকাত যথাস্থানে ব্যয় হচ্ছে না।

অধিকাংশই বেকার নষ্ট হচ্ছে; সুতরাং তাদেরকে যাকাতের সঠিক শিক্ষা দেয়া উচিত। (সুদীর্ঘ আলোচনার অংশবিশেষ)।

৫. ইরশাদ করেন, ইলম থেকে আমল জন্ম নেয়া উচিত এবং আমল থেকে যিকির জন্ম নেয়া উচিত। তবেই ইলম প্রকৃত ইলমরূপে আর আমল প্রকৃত আমলরূপে গণ্য হবে। ইলম থেকে যদি আমল জন্ম না নেয়, তাহলে তা নিছক অন্ধকার। আর আমল থেকে যদি আল্লাহর স্মরণ জন্ম না নেয়, তাহলে তা ঠুনকো। আর ইলম যিকিরও ফিৎনা।

৬. শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিকির দূর্গ ও সু-সংরক্ষিত প্রাচীর তূল্য। সুতরাং দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কোনো খারাপ পরিবেশে যেতে হলে– সে পরিবেশ যত খারাপ হবে ততই বেশি পরিমাণ যিকিরের প্রতি যত্নবান হতে হবে, যাতে মানব-দানব সব ধরনের শয়তানের প্রভাব থেকে পরিত্রাণ লাভ হয়।

৭. ইরশাদ করেন, আমি সব সময় মেওয়াত যাওয়ার সময় নেককার ও যাকিরীনের জামাতের সাথে যেয়ে থাকি। এরপরও সাধারণ পরিবেশের সাথে মেলামেশার কারণে মনের মধ্যে যে ময়লা পড়ে যায়, তা ইতিকাফের দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত কিংবা কিছু দিন সাহারানপুর বা রায়পুরের বিশেষ পরিবেশ না কাটানো পর্যন্ত তা পরিষ্কার হয় না।

অন্যদেরও তিনি মাঝে মধ্যে বলতেন যে, দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যারা সফর করে তাদের উচিত– গাশতের সময় কিংবা অন্য কোনো সময় বাইরের পরিবেশে ঘুরা ফেরার কারণে মনে যে প্রভাব পড়ে, তা নিভৃতে এবং একাকিত্বে যিকির ও ফিকিরের মাধ্যমে ধৌত করে নেয়া।

৮. ইরশাদ করেন, ইলম ও যিকিরকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা একান্ত অপরিহার্য। (এরপর তিনি ইলমও যিকিরের হাকিকত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন, যাতে তিনি বলেন,) ইলম নিছক জানার নাম নয়। লক্ষ্য কর, ইহুদি সম্প্রদায় তাদের নিজেদের শরীয়ত ও আসমানি ইলম সম্পর্কে কতখানি জ্ঞানের অধিকারী ছিল; রাসূলুল্লাহ সা. এর নায়েবের নায়েবদের হুলিয়া ও আকার অবয়ব এমনকি নবীজির শরীরের তিল সম্পর্কে পর্যন্ত অবগত ছিল। কিন্তু এসব ইলম তাদের কি কাজে এসেছে?

এখানে এই কয়েকটি উপদেশ বাণী লিখা হল। এছাড়াও হযরত দেহলবি রাহ. এবং মাওলানা ইউসুফ রাহ. এর বয়ান, উপদেশবাণী ও চিঠিপত্র প্রচুর পরিমাণে সংকলিত হয়েছে। মেওয়াতের যিম্মাদারদের নামে লেখা হযরতের একটি চিঠির আংশিক এখানে উদ্ধৃত করা হল-

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনাদের এক এক বৎসরের জন্য আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানোর সংবাদ পেয়ে এতটুকু আনন্দিত হয়েছি, যা পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার সময় নয়।

আল্লাহ পাক কবুল করুন এবং আরো তাওফিক দান করুন। এখানে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করয়ী।

ক. প্রত্যেকে নিজ নিজ হালকার একটি ফিরিস্তি তৈরি করে আমার কাছে এবং হযরত শায়খুল হাদীসের কাছে পাঠিয়ে দিন যে, কারা যিকির আরম্ভ করেছে, আর কারা আগে থেকেই করছে আর কারা ছেড়ে দিয়েছে।

খ. যারা বাইআত হয়েছে তারা বাইআতের পর বাতলে দেয়া সবকের উপর কতখানি আমল করছে।

গ. প্রত্যেক মারকাযের সাথে সংশ্লিষ্ট মক্তবগুলোর দেখাশুনা করা এবং যেখানে নেই প্রয়োজনমতে নতুন মক্তব কায়েম করা আবশ্যক।

ঘ. আপনারা নিজেরাও রীতিমত যিকির ও তালীমের আমল আরম্ভ করেছেন কিনা? না করে থাকলে এ অবহেলার কারণে অনুতপ্ত হয়ে সত্বর আরম্ভ করে দিন।

'ক' এর প্যারা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য; যাদেরকে বারো তাসবীহের সবক দেয়া হয়েছে, তারা পাবন্দির সাথে পূরণ করছে কি না, আর তারা কি আমার কাছে জেনে এ আমল আরম্ভ করেছে, না অন্য কাউকে দেখে আমল শুরু করেছে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞাসা করে বিস্তারিত লিখুন।

ঙ. নিজেদের মারকাযগুলো থেকে প্রত্যেক নাম্বারের বিস্তারিত কারগুজারি লিখে আমার নামে এবং হযরত শায়খুল হাদীসের নামে লিখে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

চ. যারা বারো তাসবীহ রীতিমত পালন করছে, তাদেরকে রায়পুর গিয়ে এক চিল্লা কাটানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

ছ. বন্ধুগণ! আপনাদের আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানোর মূল লক্ষ্য হল তিনটি বিষয়কে জীবিত করা– যিকির, তালীম, তাবলীগ অর্থাৎ তাবলীগের জন্য বের হয়ে তাদেরকে যিকির ও তালীমের পাবন্দ করা। মাকাতীব

'সাওয়ানেহে ইউসূফি' (হযরত মাওলানা ইউসূফ রাহ. এর জীবন চরিত)-তে লিখা রয়েছে যে, তিনি তাওহীদ ও নামাযকে এ কাজের বুনিয়াদ মনে করতেন। তার বক্তব্য ছিল- ইলম ও যিকির হল, দাওয়াত ও তাবলীগের আন্দোলনের জন্য দু'টি ডানা তুল্য। এ ছাড়াও তিনি তাঁর বয়ানে এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে সর্বদা এ দু'টি বিষয়ের প্রতি জোর তাগীদ দিতেন। তিনি এর গুরুত্ব এক চিঠিতে এভাবে লিখেন–

'ইলম ও যিকির এই কাজের দু'টি ডানাতুল্য। এর কোনো একটিতে দুর্বলতা কিংবা অবহেলা মূল কাজের জন্য মারাত্মক রকমের হুমকী। প্রত্যেকটি স্ব স্ব স্থানে একান্ত অপরিহার্য আবশ্যকীয়। ইলম ও যিকিরের মারকায হল, মাদরাসা এবং খানকা। আমরা আমাদের এ দু'টি ডানাকে শক্তিশালী করার জন্য উলামা-মাশায়েখের কাছে সর্বাবস্থায় সর্বভাবে মুহতাজ। তারা বিশেষত এ দু'টি বিষয়ে আমাদের অনুসরণীয়। এই ইলমে নববি ও নূরে নববির অধিকারী হওয়ার সুবাদেই তাঁদের কদর

করা, তাঁদের খেদমত করা, তাঁদের সান্নিধ্য লাভকে নিজের ইসলাহ ও নাজাতের উপায় মনে করা আমাদের জন্য আবশ্যক; এজন্যই উলামা মাশায়েখের সাথে সাক্ষাত করা, তাঁদের থেকে দুআ নেয়া, তাঁদের সামনে তাবলীগের কারগুজারী শুনানো, সৎ পরামর্শ নেয়া তাবলীগের মৌলিক নীতিমালার অন্যতম।

মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব 'সাওয়ানেহে হযরতজি' (হযরত মাওলানা ইউসুফ রাহ. এর জীবনী)-তে লিখেন, একবার আমি হযরত মাওলানার কাছে নিজের মাদরাসার ব্যস্ততার কথা বলে আরয করলাম যে, হযরত! পড়াতে পড়াতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। এখন ইচ্ছা হয় কাউকে নিজের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে কিছু দিনের জন্য তাবলীগে বের হয়ে যাবো। জবাবে তিনি ইরশাদ করেন, কস্মিনকালেও নয়, তাবলীগের আগেও এ কাজ করতে হবে এবং তাবলীগের পরেও করতে হবে।

নুষের ধারণা আমরা মাদরাসার বিরোধিতা করি। কস্মিনকালেও নয়; সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা বরং মাদরাসায় পড়ানোকে বুনিয়াদি কাজ মনে করি। শুধু তাই নয় নিজেও শিক্ষকতা করি। আমাদের তো ইচ্ছা, মাদরাসায় পড়ানোর পাশাপাশি তাবলীগের কাজটিকে জুড়ে নিবো। সাওয়ানেহে ইউসুফি আযিযি

হযরত দেহলবি রাহ. তাঁর এক দীর্ঘ চিঠিতে লিখেন, সকাল-সন্ধ্যা এবং নিজের অবস্থা মাফিক রাতের কিছু অংশ ইলম ও যিকির হাসিল করার পিছনে ব্যয় করবে।

হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর জীবনীতে হযরত মাওলানা আলী মিয়া লিখেন, 'তিনি মেওয়াতিদের দেওবন্দ, সাহারানপুর, রায়পুর ও তানাবনের দিকে পাঠাতে আরম্ভ করেন এবং এ হেদায়ত দিয়ে দেন যে, বুযুর্গদের মজলিসে তাবলীগের আলোচনা করবে না। ৫০/৬০ জন আশে-পাশের গ্রামে গাশত করবে। অষ্টম দিন শহরে সমবেত হবে। তারপর সেখান থেকে পুনরায় গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য উলামায়ে কেরাম যদি নিজ থেকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তাঁদের সামনে নিজেদের হালাত পেশ করবে; নিজে থেকে কিছু বলবে না।'

হযরত মাওলানা একবার শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেবের নামে প্রেরিত এক চিঠিতে লিখেন, বহুদিন ধরে আমার মনের বাসনা ছিল, এই জামাতগুলো বিশেষ উসূলের পাবন্দির সাথে (হক্কানি) পীর মাশায়েখের কাছে গিয়ে তাঁদের খানকার যাবতীয় আদব বজায় রেখে খানকার ফয়য লাভ করুক এবং কিছু সময় আশেপাশের গ্রামগুলোতে তাবলীগের কাজও জারী থাকবে। এ ব্যাপারে যারা আসবে তাদের সাথে পরামর্শ করে রুটিন তৈরি করে নিবেন।

খুব সম্ভব আমিও কতক দ্বীন-দরিদ্রদের নিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যে আসব। দেওবন্দ ও থানাবনও যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

মাওলানা ইউসুফ রাহ. তাঁর সকল মুতাআল্লিকীন ও তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বারবার দেওবন্দে হযরত মাদানি রাহ. এর খেদমতে এবং রায়পুরে হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরি রাহ. এর খেদমতে গিয়ে কিছু সময় কাটানোর এবং

অধিক পরিমাণে ফায়দা হাসিল করার জন্য বিশেষভাবে তাগীদ করতেন। (হযরত হাকীমুল উম্মত থানবি রাহ. এর মৃত্যু তো তাঁর সময়ের আগেই হয়ে গিয়েছিল)।

লক্ষ্য করুন, তিনি তাঁর এক পুরাতন বন্ধুকে লিখা এক চিঠিতে কতটুকুত গুরুত্বের সাথে এ বিষয়ে হেদায়ত দিচ্ছেন। তিনি লিখেন, আপনার ব্যাপারে পরামর্শের পর রায়পুর অবস্থানেরই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সুতরাং আপনি এক চিল্লাহ নয়; বরং তিন চিল্লা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে হযরতের সান্নিধ্যে থেকে সেখানকার যাবতীয় আদব বজায় রেখে আল্লাহর যিকিরের আগ্রহ এবং আল্লাহর মহব্বত জন্মানোর চেষ্টা করুন।

আমার পক্ষে তো কিছুই সম্ভব হল না। আপনিই এ মহান দৌলত হাসিল করার জন্য লেগে যান। আল্লাহ পাক আপনার সেখানে অবস্থানকে আমাদের নাজাত ও মাগফিরাতের ওসীলা করুন। হযরতের খেদমতে সালাম আরয করে এ অধমের জন্য দুআর দরখাস্ত করবেন। অন্যান্য মুরীদান ও হযরতের খেদমতে অবস্থানরত সকলের খেদমতেও সালাম ও দুআর দরখাস্ত রইল।

---- বান্দা মুহাম্মদ ইউসুফ গুফিরা লাহু
(সাওয়ানেহে ইউসুফি)

১১৮-১২৮
তাবলীগ জামাত সম্পর্কে
আল্লামা তাকী উসমানির পর্যালোচনা

তবে তাবলীগের কোনো মুরব্বির সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হলে উক্ত কথাবার্তার ব্যাপারে অবশ্যই অবহিত করি, এই এই কথা শোনা যাচ্ছে। যাচাই করা প্রয়োজন। যদি বাস্তবই হয় তাহলে এসব বন্ধ করার জন্য ভূমিকা রাখা দরকার।................

হযরতজি বলেন, আমার দ্বিতীয় আশঙ্কা হল, তাবলীগ জামাতে সাধারণ মানুষের আগমনই বেশি। আহলে ইলম এর সংখ্যা খুবই কম। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, যখন সাধারণ মানুষের হাতে এর যিম্মাদারি পড়বে, ভবিষ্যতে কখনো আবার ভুল পথে নিয়ে যায় কি না? আর সে দায়ভার আমার মাথায় পড়বে। এজন্য আমার আন্তরিক ইচ্ছা হল, আহলে ইলম অধিকহারে এ জামাতে শরীক হোন এবং তাঁদের হাতেই থাকুক এর যিম্মাদারি।...............

আমরা ছাত্রদেরকে তাবলীগে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকি। কেননা তাবলীগ নিজের ইসলাহের জন্য বড়ই উপকারী। কারণ, এর দ্বারা নেককারদের সান্নিধ্য লাভ হয়। ফলে নিজের দুর্বলতা দূরীভূত করা এবং আত্মশুদ্ধির সুযোগও পাওয়া যায়। এমনকি মাদরাসায় আট-দশ বছর পড়ালেখার দ্বারা ফাযাইলে আমলের ক্ষেত্রে ততটুকুও গুরুত্ব হয় না, যতটুকু গুরুত্ব এক চিল্লার দ্বারা হয়। পাশাপাশি ছাত্ররা আমলের ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠে। এজন্য একে নেয়ামত মনে করে ছাত্রদেরকে আমরা উৎসাহ দিয়ে থাকি।...........

তাবলীগ জামাত সম্পর্কে

আল্লামা তাকী উসমানির পর্যালোচনা

জিহাদের উদ্দেশ্য

প্রশ্ন হয় জিহাদের উদ্দেশ্য কি? খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। কুফরি শক্তির প্রভাবকে চুরমার করা তাদের দাপট ও দৌড়াত্ম্য দমন করা এবং ইসলামি শক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করাই হল জিহাদের উদ্দেশ্য।

কামান দ্বারা কি প্রচার লাভ করল ?

প্রসিদ্ধ কবি আকবর এলাহাবাদি পশ্চিমাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমালোচনার জবাবে চমৎকার কবিতা লিখেছেন। পশ্চিমারা যখন অভিযোগ তুলল, 'ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে'– তিনি জবাবে নিম্নোক্ত পংক্তি রচনা করলেন–

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پروا ہے ☆ غلط الزام بھی اوروں پر لگا رکھا ہے

یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام ☆ یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے؟

'নিজেদের দোষ-ত্রুটিগুলোর অনুভূতি তোমাদের কোথায়? ভ্রান্ত অভিযোগ অন্যদের উপর উথাপন করে রেখেছে। আর বলে যাচ্ছ যে, তরবারির জোরে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। একথা (কখনও) বলনি যে, তোপ কামান দ্বারা কি প্রসারিত হয়েছে'?

অর্থাৎ তোমরা তো অভিযোগ তুলছ, তরবারির শক্তিতে ইসলাম প্রচার লাভ করেছে। তবে তোমরা কামান দাগিয়ে বিশ্বে কি সম্প্রসার করছ? একথা বল না কেন? অথচ তোমরা তো কামান দ্বারা পুরো দুনিয়ায় চরিত্রহীনতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা ছড়িয়েছ। যদি মেনেও নেয়া হয়, তরবারির শক্তিতে ইসলাম প্রচার লাভ করেছে; তাহলে আমরা বলব, তার দ্বারা উত্তম চরিত্র, খোদাভীরুতা এবং পবিত্রতাই প্রসারিত হয়েছে। আর তোমরা ছড়িয়েছ নির্লজ্জতা এবং উলঙ্গপনা।

প্রগতিবাদিদের মতে জিহাদ শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক

ইংরেজ আমল হতে আমাদের মধ্যে একটি দল ঘাপটি মেরে আছে, পশ্চিমা বিশ্ব যখনই ইসলাম অথবা মুসলমানদের উপর কোনো অভিযোগ আপত্তি উথাপন করে, তখন ওই দলটি ইংরেজদের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। আর বলে "হুজুর! আপনারা ভুল বুঝেছেন। আসলে আমাদের ধর্মে এমন কথা নেই। দুর্বলতা স্বীকার করেই এসব কথা বলতে থাকে। যখন পশ্চিমাদের পক্ষ হতে এ অপপ্রচার শুরু হল,

ইসলাম তরবারির শক্তিতে প্রচার লাভ করেছে, তখন জবাবে ওই দলটি বলতে লাগল- ইসলামে যে জিহাদের কথা রয়েছে, তা শুধু আত্মরক্ষার জিহাদ। অর্থাৎ 'যখন কোনো শত্রু আমাদের উপর আক্রমণ করে, তখন আমরা আত্মরক্ষার নিমিত্ত জিহাদ করি। তবে শুরুতেই আক্রমাত্মক জিহাদ ইসলাম সম্মত নয়। উদ্দেশ্য হল, যদি প্রতিপক্ষ আমাদের উপর হামলা করে তবেই আমরা তাদের জবাব দেব। পক্ষান্তরে যদি তারা আমাদের উপর হামলা না করে, তবে তাদের উপর আক্রমণ করা এবং জিহাদ জায়েয নয়। মনে হয় যেন আত্মরক্ষামূলক জিহাদ জায়েয আর আক্রমাত্মক জিহাদ জায়েয নয়। অতঃপর তারা নিজেদের অবস্থানে অটল থাকার জন্য কুরআন কারীমের আয়াত দ্বারা বিভ্রান্তিকর দলীলও পেশ করে থাকে। যেমন তারা বলে-

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير

এখানে বলা হয়েছে, যদি কারো সাথে তাদের কোনো প্রতিপক্ষ যুদ্ধ করে এবং অত্যাচার করে তবেই তাদের জন্য জিহাদের অনুমতি রয়েছে। অত্যাচারিত লোক ব্যতীত কারো জন্য জিহাদের অনুমতি নাই। তদ্রুপভাবে আরো প্রমাণ করতে চায়- قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 'তোমরা তাদের সাথে আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে'। এ আয়াতে প্রথমে আক্রমণ এবং জিহাদ এর অনুমতি দেওয়া হয়নি। উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে তারা বলে- জিহাদ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য অনুমোদিত হয়েছে। যখন মুশরিকরা তোমাদের উপর আক্রমণ বা অত্যাচার করে, তাদের প্রতিরোধে তোমরা জিহাদ করবে। কিন্তু যদি তারা আক্রমণ না করে এবং অত্যাচার না করে তবে জিহাদের অনুমতি নেই।

জিহাদের আহ্‌কাম ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয়েছে

শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক জিহাদই জায়েয, আক্রমাণাত্মক জিহাদ জায়েয নেই।' এটি এমন একটি কথা, চৌদ্দশত বছর ধরে ফুকাহায়ে উম্মতের কেউই তা গ্রহণ করেন নি।

মূলত জিহাদের আহ্‌কাম ক্রমান্বয়ে কয়েক স্তরে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথম রাসূল পাক সা. কে মক্কি জীবনে তরবারি উত্তোলন করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। তখন নির্দেশ ছিল, ধৈর্য্য ধারণ করুন। আরও নির্দেশ ছিল, যদি কোনো ব্যক্তি আপনাদের কষ্ট দেয়, তাতে কোনো প্রকার প্রতিঘাতের পন্থা অবলম্বন করবেন না। তা ছাড়া মক্কি জীবনে কোনো প্রকার জিহাদের অনুমতিও ছিল না। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে মাত্র; ফরয করা হয়নি। এ প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়-اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا।

এ আয়াতে সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তৎসঙ্গে একটি শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি তোমাদের উপর হামলা করে বা অত্যাচার

করে বা তোমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে, তবেই তোমাদের জন্য পাল্টা হামলা করার অনুমতি আছে।

আক্রমণাত্মক জিহাদের বৈধতা

এর পর তৃতীয় পর্যায়ে আত্মরক্ষামূলক জিহাদের অনুমতি দেওয়া হল। ইরশাদ হচ্ছে- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ 'তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে সশস্ত্র জিহাদ কর, যারা তোমাদের উপর সশস্ত্র হামলা করে।' এরপর চতুর্থ পর্যায়ে আক্রমণাত্মক জিহাদের অনুমতিসহ আয়াত নাযিল হয়- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ 'তোমাদের উপর সশস্ত্র জিহাদ ফরয করা হয়েছে।' উদ্দেশ্য হল, এখন জিহাদ এ অর্থেই সীমিত নয় যে, 'শুধু আত্মরক্ষার্থেই জিহাদ জায়েয' বরং প্রথমেই হামলা ফরয করা হয়েছে। অতঃপর সূরায়ে তাওবার নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ 'সম্মানী মাসসমূহ শেষ হয়ে গেলে মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও কতল করো এবং তাদেরকে পাকড়াও করো ও অবরোধ করো'।

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আলী রাযি. মানুষের নিকট রাসূল সা. এর ঘোষণা পৌঁছে দেন যে, যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে, তাদেরকে সে পরিমাণই অবকাশ দেওয়া হল। আর যাদের সাথে কোনো চুক্তি নেই, তাদেরকে চার মাসের সুযোগ দেওয়া হল। এর মধ্যে তারা আরবভূমি ত্যাগ করবে। নতুবা তাদের জন্য জিহাদের ঘোষণা রইল। সুতরাং উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে, প্রথমেই আক্রমাত্মক জিহাদ জায়েয। এখন কেউ যদি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াতকে অবলম্বন করে বলে, জিহাদ তো জায়েযই নেই। কেননা মুসলমানদেরকে ধৈর্যের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, যদি মুশরিকরা তোমাদের কষ্ট দেয়, তাহলে তোমরা ধৈর্য ধারন করো। একথা সুস্পষ্ট যে উপরোক্ত মন্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। ঠিক এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি আত্মরক্ষামূলক জিহাদের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ আয়াত অবলম্বন করে বলে- মুসলমানদের জন্য আত্মরক্ষামূলক জিহাদ জায়েয, তবে আক্রমাত্মক জিহাদ জায়েয নেই- তাহলে এ কথাও ভুল। মূলকথা হল, ইসলামে শুরুতে হামলা করা বা আক্রমণাত্মক জিহাদ জায়েয।

দ্বীনদার লোকদের একটি ভুল ধারণা ও এর জবাব

এতো ছিল প্রগতিবাদিদের অলীক দাবীর বিশদ জবাব। অর্থাৎ পশ্চিমাদের ভয়ে ভীত হয়ে তারা শুধু আত্মরক্ষার জিহাদকেই জায়েয মনে করে। তাছাড়া খাস দ্বীনদার লোকদেরও একটি ভুল ধারণা আছে। ধীরে ধীরে তা প্রসার লাভ করছে। আর আমাদের তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরাও এ ভুল ধারনার শিকার। তাই এদিকে একটু আলোকপাত করতে চাই। সে ভ্রান্ত ধারনা হল, জিহাদ শুধুমাত্র ওই সময় এবং ওই জাতির সাথে করতে হবে, যখন কোনো জাতি দাওয়াতের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

হলে হয় যেন দাওয়াতই আসল উদ্দেশ্য। আর যদি কোনো দেশ বা জাতি দাওয়াত এর পথে কোনো প্রকার বাঁধার সৃষ্টি করে অথবা নিজ দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি না দেয়, তখন জিহাদ করা যাবে। আর যদি কোনো দেশ বা রাজ্য দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে– এসো, আমাদের এখানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ কর। তাহলে জিহাদের প্রয়োজন নেই এবং অনুমতিও নেই। এটি প্রগতিবাদিদেরই উক্তি। এখন এ কথাগুলো বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষিত দ্বীনদার ভাইয়েরা, এমনকি তাবলীগ জামাতের ভাইরাও বলতে শুরু করেছে। প্রথম প্রথম তো শুধু মুখে মুখে বলতেন। এখন তারা লিখতেও শুরু করেছেন। মোটকথা, শুধু জিহাদের বাস্তবতা না বুঝার কারণেই তারা এসব কথা বলছেন।

বস্তুত শুধুমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি যদি কোনো কাফির দেশ প্রদান করে, তাহলে তার সাথে জিহাদ করবে না। একথা বড়ই বিপদজনক। কেননা শুধু তাবলীগের দ্বারা তো জিহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। জিহাদের উদ্দেশ্য হল, কুফরি শক্তির দাপট খর্ব করা, তাদের দৌরাত্ম্য দমন এবং আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করা। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরি শক্তি টিকে থাকবে,ততক্ষণ পর্যন্ত শাশ্বত দ্বীন গ্রহণে মানুষের মন-মানসিকতা বিকশিত হবে না। কেননা দেখা যায় যখন কোনো জাতির রাজনৈতিক শক্তি এবং কর্তৃত্ব মানুষের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে যায়, ওই জাতির কথা জনসাধারণের খুব সহজে বুঝে আসে। এর বিপরীত কথা খুব সহজে অন্তরে স্থান পায় না। একথাগুলো অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি। কারণ পশ্চিমাদের সম্পূর্ণ অসত্য কথাগুলো মানুষ যে শুধু শুনেই যাচ্ছে, তা নয় বরং নির্দ্বিধায় মেনেও নিচ্ছে এবং তাদের কথা মত কাজও করছে। কারণ, আজ পূরা দুনিয়ার অর্থনীতি তাদের হাতে। মুদ্রা তাদের, আর কর্তৃত্বও চলেছে তাদের। গোটা বিশ্বে তাদের চিন্তা ধারা প্রতিফলিত হচ্ছে। গোটা দুনিয়ার পরিস্থিতি যখন এরূপ তখন যদি কোনো পশ্চিমা দেশ দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য ভিসা প্রদান করে এবং তাবলীগের জন্য সাধারণ অনুমতিও প্রদান করে, তবু এতটুকুতেই জিহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শক্তি ও দাপট চুরমার না হবে, তাদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত না হবে, মানুষের মন-মেধায় ছেয়ে থাকা ভীরুতা এবং জড়তা দুর না হবে। আর তাদের মোকাবালা করা ব্যতীত তাদের এ দাপট, এ প্রভাব, কর্তৃত্ব এবং ত্রাস বিনাশ হবে না। কাজেই কোনো দেশ তাবলীগের অনুমতি দিলে জিহাদের প্রয়োজন নেই বলা নিছক এক ধোঁকা বৈ আর কিছু নয়।

জিহাদ অস্বীকারকারী কাফির

প্রশ্ন হয়, যদি কোনো ব্যক্তি বা দল আক্রমাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করে, তবে ইসলামি শরীয়তে তাদের অবস্থান কি? যেহেতু জিহাদ দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত, তদুপরি যারা শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদের দাবীদার, তাদেরকে কাফির বা পথভ্রষ্ট বলা যায় কি?

একথা পূর্বেও বলেছি যে, তাদের ওই চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভুল। তবে তাদেরকে এ কারণে কাফির বলাও মুশকিল। কেননা কাউকে কাফির আখ্যা দেওয়া এমনই একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যেখানে একশত ভাগ সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি। কারণ, যে ব্যক্তি বা দল সাধারণ জিহাদকে অস্বীকার করে, নিঃসন্দেহে তাকে কাফির বলা যাবে। যেহেতু জিহাদের বৈধতা তো শুধু দ্বীনের প্রয়োজনেই। তবে যে ব্যক্তি বা দল শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জিহাদের প্রবক্তা, আক্রমাণাত্মক জিহাদের অস্বীকারকারী, তাদেরকে শরয়ী পরিভাষায় مأول বা তাবীলকারী বলে। আর مأول কে কাফির বলা যায় না। তবে তাদের চিন্তাধারা যে ভুল ও ভ্রান্ত এটা সুস্পষ্ট। এ শুধু গবেষণামূলক দ্বন্দ্ব নয়। রীতিমত সত্য-মিথ্যার পার্থক্য। তারা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে কাফির বলা যায় না।

ইসলাম হানাহানির ধর্ম এ অভিযোগ কেন?

একজন প্রশ্ন করল, পশ্চিমারা জিহাদ প্রসঙ্গে একটি অপবাদ ছড়িয়েছে যে, ইসলাম হানাহানি-খুন খারাবির ধর্ম।

এ অভিযোগ ও অপবাদ তখনই আরোপ হওয়া উচিত ছিল, যখন মুসলমানরা জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বজগতকে আলোড়িত করেছিল। বাস্তবে ওই সময় এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারত যে, মুসলমানদের এ বিজয় অভিযান সম্ভবত কোনো রক্তঝরা শিক্ষারই ফল। কিন্তু আজ যখন মুসলমানরা সর্বকূলেই পরাজিত এবং অনিবার্য পতনোম্মুখ, তখন এ অভিযোগ এবং অপবাদের কোনো অর্থ নেই।

মূলত কথা হল, মুসলমানরা এখন যদিও দুর্বল, তবে মুসলমানদের ইতিহাস সাক্ষী, যখনই আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে মাথা উচুঁ করার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদের মাঝে একতা সৃষ্টি হয়েছে, মুসলমানরা তখন শত্রুদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে এবং তাদের পরিকল্পনাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। বর্তমান দুনিয়ার পরাশক্তি যদিও মুসলমানদের দুর্বল দেখছে, তবু তারা ভীতসন্ত্রস্ত্র যে, যদি ঘুমন্ত সিংহ কখনো জাগ্রত হয় তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। পশ্চিমা শক্তি যদিও মুসলমানদের দাবিয়ে রেখেছে, এ দাবিয়ে রাখার উদাহরণ হল সে কল্প-কাহিনীর মত। কৌতুক আছে- এক দুর্বল ব্যক্তি মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা এক বাহাদুরকে ধরাশায়ী করল। অতঃপর তার বুকে চেপে বসে কান্না জুড়ে দিল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল- তুমি কাঁদছ কেন? উত্তরে সে বলল- এ আশঙ্কায় কাঁদছি যে, এ বাহাদুর উঠে এখন আমায় মারবে। একই অবস্থা পশ্চিমাদের। শক্তিতে তো মুসলমানদেরকে ধরাশায়ী করেছে, মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করেছে মুসলমানদের মাঝে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত। যাতে মুসলমানরা একতাববদ্ধ হতে না পারে। তদুপরি ভেবে অস্থির যে, যদি মুসলমানদের হুঁশ ফিরে আসে, তাহলে আমাদের পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ।

জিহাদের শর্তসমূহ

জনৈক ছাত্র প্রশ্ন করল, নুবুওয়াতের প্রাথমিক তের বছর পর্যন্ত পারিভাষিক অর্থে জিহাদ ছিল না। ধৈর্য ও সাধনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আমল স্বচ্ছ হয়ে গেলে পরবর্তীতে মাদানি জীবনে জিহাদ ও সশস্ত্র যুদ্ধের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। প্রশ্ন হল, বর্তমান সময়ের মুসলমানরা যেহেতু আত্মশুদ্ধির মাপকাটিতে অবতীর্ণ হতে পারে নি; তাই জিহাদের পূর্বে আত্মশুদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করা কি প্রয়োজন নয়?

বড় চমৎকার প্রশ্ন। আসল কথা হল- মৌলিকভাবে আক্রমাণাত্মক জিহাদই শরীয়ত নির্দেশিত জিহাদ। তবে শর্ত সাপেক্ষে। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই শর্তসমূহ পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ শুধু নিষেধ নয়; বরং রীতিমত ক্ষতিকরও বটে। প্রথম শর্ত হল জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ হতে হবে। ফি- সাবিলিন্নফস নয়। অর্থাৎ জিহাদের উদ্দেশ্যে থাকবে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ ও দ্বীনকে সমুন্নত করা। যদি কোনো ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে জিহাদ করে যে, আমার নাম প্রচার হবে, মানুষ আমাকে বীর মুজাহিদ বলবে, বাহাদুর বলবে, আমি নন্দিত হব, তাহলে এ জিহাদ ফি-সাবিল্লাহ নয়। এ জিহাদ হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বার্থে। কাজেই মুজাহিদের জন্য আত্মশুদ্ধির সাধনা অনিবার্য। এ দৌলত লাভের পরই তাঁর জিহাদ ফী-সাবিলিল্লাহ হবে। আরও একটি শর্ত হল, জিহাদে একজন আমীর বা নেতা থাকতে হবে। সে আমীর বা নেতার নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত থাকতে হবে। যদি একমত ভিত্তিক আমীর না হয় তবে জিহাদ শেষে নিজেদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবে। যেমন চলেছে আফগানিস্তানে। আর আমীর না থাকলে জিহাদের ফল হয় শূন্য। কাজেই জিহাদের জন্য ঐক্যমতভিত্তিক একজন আমীর বা নেতা আবশ্যক। জিহাদের আরো একটি শর্ত হল, জিহাদ বা যুদ্ধের জন্য শক্তি অর্জন করতে হবে। শক্তি অর্জন ব্যতীত জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া নিজ মাথায় আঘাত করার নামান্তর। কাজেই শক্তি অর্জন ব্যতীত জিহাদ জায়েয নেই। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এ তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ এ শর্তগুলো অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। আর যখনই শর্তগুলো পাওয়া যাবে তবেই শুরু হবে জিহাদ।

জিহাদের ব্যাপারে তাবলীগ জামাতের দৃষ্টিভঙ্গি

এক ছাত্র প্রশ্ন করল- তাবলীগ জামাতের কোন্ কিতাবে আছে যে, তাবলীগিরা বর্তমান সময়ে জিহাদ ফরয হওয়াকে অস্বীকার করেন? উলামায়ে কেরাম কি তাবলীগ জামাতের যিম্মাদার আলিমদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন?

কথা হল, তাবলীগ জামাতের ব্যাপারে কোনো কোনো ভাই-বন্ধু আমার নিকট এসে অনেক কথাই বর্ণনা করে থাকেন। যেমন, তাবলীগের অমুক ব্যক্তি তার বয়ানে এ এ আলোচনা করেছেন এবং এমন বয়ানও করেছেন যে, বর্তমানে যেখানে যেখানে জিহাদ চলছে, কাশ্মীরে, বসনিয়ায় যেখানেই হোক এ জিহাদ শরীয়ত সম্মত নয়। মূল বিষয় হল দাওয়াত। কোনো কোনো ভাই এ জাতীয় কথাবার্তা আমার নিকট এসে

বর্ণনা করেন। তবে যেহেতু বর্ণনা ভঙ্গি বা বুঝতে ভুলও হতে পারে তাই নিজ কানে না শোনা করা পর্যন্ত তাবলীগ জামাতের কোনো বুযুর্গের প্রতি আমি উক্ত কথাবার্তার সম্বন্ধ করি না। তবে তাবলীগের কোনো মুরব্বির সাথে সাক্ষাতে সুযোগ হলে উক্ত কথাবার্তার ব্যাপারে অবশ্যই অবহিত করি, এই এই কথা শোনা যাচ্ছে। যাচাই করা প্রয়োজন। যদি বাস্তবই হয় তাহলে এসব বন্ধ করার জন্য ভূমিকা রাখা দরকার।

কিন্তু তাবলীগের একজন প্রভাবশালী মুরব্বির একটি চিঠি পড়ার সুযোগ হয়। যাকে আমি খুব সম্মান করি। উক্ত চিঠি তিনি একজন সাথীর বরাবরে লিখেছিলেন। ওই সাথী চিঠিখানা আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। চিঠির সমস্ত লেখারই ইঙ্গিত হল, বর্তমানে জিহাদের প্রতি মনোনিবেশ করা, জিহাদের ব্যাপারে চিন্তা করা এবং জিহাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা ঠিক নয়। মূলতঃ জিহাদ তো দাওয়াত এর জন্য। যদি দাওয়াতের স্বাধীনতা থাকে তাহলে জিহাদের প্রয়োজন তো নাই; বরং ক্ষতিকর। পাশাপাশি আরও লিখেছেন, এ কথাগুলো মানুষের বুঝে আসছে না। তবে ধীরে ধীরে আলিম সমাজেরও বুঝে আসবে।

এ চিঠির দ্বারা বুঝে আসে- তাবলীগ জামাতের মুরব্বিদের ব্যাপারে যা শোনা যায়, তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়; বরং এ চিন্তাধারা দিন দিন প্রবল হচ্ছে। এতে চুপ থাকা যায় না। আর এজন্য আমরা তাবলীগের মুরব্বিদের সাথে মৌখিক আলোচনাও করেছি, যাঁদের সাথে আমাদের সু-সম্পর্ক আছে। বড়দের নিকট পৌছে দেওয়ার গুরুত্বারোপও করেছি। কারণ, যে ধরনের কথাবার্তার উদ্ভব হচ্ছে, তা বড়ই ভয়ানক। উক্ত চিঠিখানা আমার নিকট আজো রয়েছে। কারো পড়ার ইচ্ছা হলে পড়তে পারবেন।

তাবলীগ জামাতের দ্বীনি খিদমত

আলহামদুলিল্লাহ! উপরোক্ত কথাগুলো সংশোধনের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। তাবলীগ এমন একটি জামাত, যার কার্যক্রমে অন্তর খুশি হয়ে যায়। এ জামাত দ্বীনের এমন এক উঁচু কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে, যা অন্য কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি। এ জামাতের ওসিলায় আল্লাহ্ তাআলা দ্বীনের কালিমাকে কোথা হতে কোথায় পৌছে দিয়েছেন। হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর ইখলাস ও ঈমানি জযবার বদৌলতে এ জামাত আজো টিকে আছে। আল্লাহ তাআলার পয়গাম ও দাওয়াতকে দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

সহযোগিতা ও সতর্কীকরণ

স্মরণ রাখতে হবে, কোনো জামাত বা দল প্রসার লাভ করা এবং এর আহবান দূর দিগন্তে পৌছে যাওয়া যদি সঠিক পদ্ধতিতে হয়, তাহলে তা প্রশংসনীয়। এমতাবস্থায় ওই জামাতের সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু যদি ওই জামাতের মাঝে কোনো অশুভ বিষয়াদি জন্ম নেয় অথবা কোনো ভুল চিন্তাধারার উদ্ভব হয়, তাহলে সহযোগিতার পাশাপাশি সতর্ক করাও আবশ্যক। যাতে করে এমন একটি উত্তম জামাত, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা দ্বীনের বহুমুখী খেদমত নিচ্ছেন, কোনো ভুল পথে চলে না যায়।

বিশেষতঃ ওই অবস্থায় সতর্কীকরণ বেশি প্রয়োজন যখন এর নেতৃত্ব কোনো পাক্কা আহলে ইলমের হাতে না থাকে। কেননা এ জামাতের অনুসারী অধিকাংশই সাধরণ মুসলমান; উলামায়ে কেরামের সংখ্যা অপ্রতুল। আর মুষ্ঠিমেয় যারা আছেন, তাদের ইলম চর্চারও কোনো ব্যবস্থা নেই।

আলিম সমাজ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর আলিম সমাজ, যাঁরা তালীম-তায়াল্লুম এবং ফতওয়া লিখনে ব্যস্ত আছেন। এ শ্রেণীর উলামা ইলম এর সাথে সম্পৃক্ত।। দ্বিতীয় শ্রেণীর উলামা, যাঁদের ইলম নিয়ে কোনো ব্যস্ততা নেই। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁদের ইলম তো অবশ্যই আছে, তবে ইলম এর ঘষামাজা নেই বলেই তাঁদের অন্তরে ভুল চিন্তাধারার উদ্ভব হতে পারে।

হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর একটি ঘটনা

আমি আপনাদের কে হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর একটি ঘটনা শোনাব। হযরত মাওলানা এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমার মুহ্তারাম আব্বা হযরজ মাওলানা মুফতী শফী রাহ. কোনো কাজে দেওবন্দ হতে দিল্লী গিয়েছিলেন। দিল্লীতে গিয়ে আব্বাজান সংবাদ পেলেন হযরতজি অসুস্থ। তাঁকে দেখার জন্য আব্বা নেযামুদ্দিনে চলে গেলেন। সেখানে পৌছে জানতে পারলেন, ডাক্তার সবাইকে দেখা করতে নিষেধ করেছেন। আব্বাজান উপস্থিত লোকদের বললেন, আমি তো হযতরকে দেখার উদ্দেশ্যেই এসেছিলাম। অবস্থা জানলাম, কিন্তু ডাক্তাররা দেখা করতে নিষেধ করেছেন। তাই আর দেখা করলাম না। অতএব হযরত যখন সুস্থ হয়ে উঠবেন হযরতকে আমার আগমন সংবাদ দিবেন। আর আমার সালাম বলবেন। এরপর আব্বাজান রওয়ানা করলেন। কেউ ভেতরে গিয়ে হযরতকে সংবাদ দেন যে, হযরত মুফতী সাহেব এসেছিলেন। সাথে সাথে হযরতজি মুফতী সাহেব রাহ. কে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। ওই ব্যক্তি মুফতী সাহেব রাহ. এর নিকট পৌছে বলল, হযরতজি আপনাকে ডেকেছেন। আব্বাজন বললেন, ডাক্তারগণ যেহেতু দেখা করতে নিষেধ করেছেন, তাই দেখা না করাই ভাল হবে। লোকটি বলল, হযরতজি আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়তার সাথে আদেশ করেছেন। হযরত মুফতী সাহেব বলেন, আমি ওই ব্যক্তির সাথে ফিরে গেলাম, এর পর হযরতজির কাছে গিয়ে বসলাম এবং অবস্থা জেনে নিলাম। তারপর হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. আমার হাত তাঁর হাতের মধ্যে রেখে অঝোরে কান্না শুরু করলেন। হযরত মুফতী সাহেব রাহ. বলেন, আমি ভাবলাম- হযরত অসুস্থতার দরুন মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। তাই শান্তনামূলক কিছু কথা বললাম। হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. বললেন, আমি অসুস্থতার কষ্টে কাঁদছি না।

আমি দুটি শঙ্কায় শঙ্কিত

আমি দুটি শঙ্কায় শঙ্কিত। বিধায় আমার কান্না হচ্ছে। হযরত আব্বাজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি আশঙ্কা হচ্ছে? হযরতজি বললেন, তাবলীগ জামাতের কাজ দিন

দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। এর ফলাফলও ভাল দেখছি। মানুষ দলে দলে এ জামাতের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে, তাবলীগ জামাতের এ সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকে استدراج (ইসতেদরাজ) কি না। ইসতেদরাজ বলা হয়, কোনো বাতিলকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সুযোগ দেওয়া হবে এবং তার বাহ্যিক সফলতাও অর্জন হবে। তবে বাস্তবে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ নয়। এর দ্বারা অনুমেয় যে, মাওলানা ইলয়াস রাহ. কত উচ্চ পর্যায়ের বুযুর্গ ছিলেন। তার ভয় হচ্ছিল, তাবলীগ জামাতের কার্যক্রম এবং এর সফলতা ইসতেদরাজ কি না।

এ কাজ ইসতেদরাজ নয়

হযরত মুফতী সাহেব বলেন, আমি সাথে সাথে বললাম, হযরত! তাবলীগ জামাতের কার্যক্রম ইসতেদরাজ নয়। হযরতজি বললেন, আপনার নিকট কি প্রমাণ আছে যে এ কাজ ইসতেদরাজ নয়? আব্বাজান বললেন, হ্যাঁ, প্রমাণ আছে। কোনো ব্যক্তি বা দলের কাজ ইসতেদরাজ হলে তার মস্তিষ্কে কখনো ইসতেদরাজ এর ভাবনাই আসে না। তাই আপনার ভাবনা ও আশঙ্কাই প্রমাণ করে যে, এ কাজ ইসতেদরাজ নয়। যদি এমন হত তাহলে কখনোই আপনার অন্তরে এ আশঙ্কা জাগ্রত হত না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, এটি আল্লাহর সাহায্য বৈ আর কিছু নয়। আব্বাজান বলেন, আমার এ জবাব শুনে তাঁর চেহারার প্রফুল্লতা ফুটে উঠল। তিনি বললেন,আলহামদুলিল্লাহ! আপনার কথায় আমি আশ্বস্ত হলাম।

দ্বিতীয় আশঙ্কা

হযরতজি বলেন, আমার দ্বিতীয় আশঙ্কা হল, তাবলীগ জামাতে সাধারণ মানুষের আগমনই বেশি। আহলে ইলম এর সংখ্যা খুবই কম। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, যখন সাধারণ মানুষের হাতে এর যিম্মাদারি পড়বে, ভবিষ্যতে কখনো আবার ভুল পথে নিয়ে যায় কি না? আর সে দায়ভার আমার মাথায় পড়বে। এজন্য আমার আন্তরিক ইচ্ছা হচ্ছে, আহলে ইলম অধিকহারে এ জামাতে শরীক হোক এবং তাঁদের হাতেই থাকুক এর যিম্মাদারি। আব্বাজান বললেন, আপনার এ চিন্তা সম্পূর্ণ সহীহ। যেহেতু আপনি নেক নিয়তেই কাজ শুরু করেছেন, তাই ভবিষ্যতে যদি কেউ একে ভুল পথে নিয়ে যায়, তার কোনো দায়ভার আপনার উপরে আসবে না– ইনশাআল্লাহ। যাহোক একথা সত্য যে, আহলে ইলমদের উচিত এগিয়ে এসে তাবলীগ জামাতের যিম্মাদারি গ্রহণ করা। হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহ. এর এ ঘটনা আমি আব্বাজানের কাছে বহুবার শুনেছি। এর দ্বারা অনুমেয় যে মাওলানা ইলয়াস রাহ. ইখলাসের এক পাহাড় ছিলেন। কিরূপ তাঁর দ্বীনী জয্‌বা ছিল!

তাবলীগ জামাতের বিরোধিতা জায়েয নয়

বাস্তবতা হল, এমন কিছু লোকের হাতে এর যিম্মাদারি পড়েছে, যাদের ইলমে গভীরতা নেই। ফলে মাঝে মধ্যে কিছু অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। এ অসঙ্গতির কারণে তাবলীগ জামাতের বিরোধিতা করা জায়েয নয়। কেননা সামগ্রিকভাবে তাবলীগ

জামাতের কার্যক্রম বড়ই উত্তম। এর সহযোগিতা করা উচিত। যথাসম্ভব আহলে ইলম এতে অংশগ্রহণ করা এবং সহযোগিতার ধাবাহিকতা বজায় রাখা উচিত।
আহলে ইলমগণ অংশগ্রহণের পাশাপাশি উপকারের চিন্তা করতে হবে। সৃষ্ট অসঙ্গতিগুলো দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কাজেই যেসব উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করবেন, এ চিন্তা মাথায় রেখেই অংশগ্রহণ করবেন যে, আমাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের পাশাপাশি এ জামাতকে ভুল পথ থেকে ফেরাতে হবে। এমন যাতে না হয়, আহলে ইলমগণ এ জামাতের মাঝে সৃষ্ট ভুল এবং অসঙ্গতির স্রোতে ভেসে যান।

তাবলীগ জামাতের অসঙ্গতি

উদাহরণতঃ তাবলীগ জামাতের একটি বিশেষ অসঙ্গতি হল, প্রথম প্রথম তাবলীগি লোকজন ও তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলমানগণ ফতওয়ার ব্যাপারে আহলে ইফতা (মুফতিয়ানে কিরাম) এর শরণাপন্ন হতেন। তবে আজকাল ওখানেও ফতওয়া প্রদান করা হচ্ছে এবং মাসাইল এর ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে উম্মতের সাথে মত পার্থক্যের একটা ভাবও সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো লোক তো বিচ্ছিন্নতার কথা বলতে শুরু করেছেন। যেমন, বলে থাকেন- এখন তাবলীগিদের উচিত তাবলীগ করেন এমন মুফতী সাহেবের কাছে ফতওয়া চাওয়া; অন্য কোনো মুফতী সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয়। কোনো কোনো সময় এ জামাতের যিম্মাদারগণ এমন সিদ্ধান্ত নেন, যা শরীয়ত সম্মত নয়। যেমন দাওয়াত ও তাবলীগ ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া? এ ব্যাপারে পৃথক একটি অবস্থান ঠিক করে নিয়েছেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগ শুধু ফরযে আইন নয়; বরং নির্ধারিত পদ্ধতিতেই করা ফরযে আইন। যে ব্যক্তি এ নির্ধারিত তরীকায় করবে না, সে ফরয তরককারী হবে। এ জাতীয় কথা বড়ই আপত্তিকর। এমনিভাবে জিহাদ প্রসঙ্গেও নানা কথা শোনা যায়।

ছাত্ররা তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণ করবে

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা ছাত্রদেরকে তাবলীগে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকি। কেননা তাবলীগ নিজের ইসলাহের জন্য বড়ই উপকারী। কারণ, এর দ্বারা নেককারদের সান্নিধ্য লাভ হয়। ফলে নিজের দুর্বলতা দূরীভূত করা এবং আত্মশুদ্ধির সুযোগও পাওয়া যায়। এমনকি মাদরাসায় আট-দশ বছর পড়ালেখার দ্বারা ফাযাইলে আমলের ক্ষেত্রে ততটুকুও গুরুত্ব হয় না, যতটুকু গুরুত্ব এক চিল্লার দ্বারা হয়। পাশাপাশি ছাত্ররা আমলের ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠে। এজন্য একে নেয়ামত মনে করে ছাত্রদেরকে আমরা উৎসাহ দিয়ে থাকি। তবে তাবলীগে সময় লাগানোর পাশাপাশি ছাত্রদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, সে যেন তাবলীগ জামাতের উল্লেখিত আপত্তিজনক কাজে নিজেকে না জড়িয়ে সেগুলো দূর করার চিন্তা করবে। এমন যেন না হয় যে, সে নিজেই তাতে ভেসে যায়; তাদের হ্যাঁ এর সুরে হ্যাঁ বলতে থাকে।

এ হল ওই জামাতের আসল অবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ! এখনো এ আপত্তিকর অবস্থার পাশাপাশি তাবলীগের মধ্যে ভালর দিকটাই প্রবল। আর সামগ্রিকভাবে এর দ্বারা ফায়দাও হচ্ছে। তবে ওই সকল আপত্তিকর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখেই এতে অংশগ্রহণ করা উচিত। বর্তমান অবস্থা হল, যখনই কোনো ব্যক্তি আপত্তিকর অবস্থার সামান্যতম

সংশোধনের চেষ্টা করে, তখন তার নামে তাবলীগ বিরোধী বলে অপপ্রচার শুরু হয়ে যায়। এ বড় ভয়ানক অবস্থা।

বর্তমানে জিহাদ আক্রমণাত্মক না প্রতিরোধমূলক?

জনৈক ছাত্র জিজ্ঞাসা করল- বর্তমানে জিহাদ আক্রমণাত্মক না প্রতিরোধমূলক? জবাব হল, বর্তমানের সকল জিহাদ যেমন, বসনিয়া কাশ্মীরে হচ্ছে সবই প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষামূলক। কাফিররা মুসলমানদের উপর আক্রমাণ করেছে। দেশ বিভক্তির প্রাক্কালে কথা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। সে মতে কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ। কিন্তু ভারত অন্যায়ভাবে তা দখল করে নেয়। এজন্য কাশ্মীরকে দখলকৃত বলা হয়। ওই এলাকার মুসলমানরা ভারতীয় কাফিরদের দখলদারিত্ব থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে যে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে, এ জিহাদই হল 'প্রতিরোধমূলক'।

পূর্বে আলোচিত কথাগুলো ভুল না বুঝা

তাবলীগ জামাত প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত কথাগুলো একান্ত মনে গ্রহণ করা চাই। কোনো কথা যখন কোনো সভা বা মজলিশে আলোচনা করা হয়, কোনো প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা ছাড়া অন্যের নিকট ভুলভাবে ব্যক্ত করা হয়। আবার কখনো কথার একাংশ ব্যক্ত করা হয়; দ্বিতীয় অংশ অবর্ণনীয়ই থেকে যায়। ফলশ্রুতিতে ইসলাহ্ হয় না; উল্টো ফিতনার সৃষ্টি হয়। আপনাদেরকে বলার উদ্দেশ্যে হল, আপনারা এখন দরসে নেযামি হতে অবসর নিবেন। আপনাদের উচিত প্রত্যেকটি বিষয়কে তার স্ব-স্থানে রেখেই তার উৎসমূল খুঁজে বের করা এবং সে অনুযায়ী আমলের তরীকা অবলম্বন করা। এজন্য সবকথা আপনাদেরকে বলা হল। কাজেই কেউ যেন না বলে আমি তাবলীগ বিরোধী।

তাবলীগ জামাত নিষ্পাপ নয়

যা হোক! আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট করে বলেছি যে, তাবলীগের মধ্যে ভালর দিকটাই প্রবল। তাই একে গণীমত মনে করে সহযোগিতা করতে হবে। তবে ভালোর দিকটা প্রবল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এতে কোনো ভুল-ত্রুটি নেই কিংবা একেবারে নিষ্পাপ।

উলামায়ে কেরাম দ্বীনের পাহারাদার

আহ্‌লে ইলম উলামায়ে কেরাম হলেন দ্বীনের পাহারাদার। আমরা তো তালিবে ইলম। আল্লাহ তাআলা আহ্‌লে ইলমদেরকে দ্বীনের পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন। একবার আমি জনৈক ব্যক্তির নিকট এ জাতীয় কিছু কথাবার্তা বলার পর জবাবে ওই ব্যক্তি বলেন, 'এ মৌলবিরা তো ইসলামের ঠিকাদার। তারা যদি বলে এটা ইসলাম, তো তা ইসলাম। আর যদি বলে, এটা ইসলাম নয়, তো তা ইসলামের অন্তর্ভূক্ত নয়।' জবাবে আমি তাকে বললাম, কেউ তো ইসলামের ঠিকাদার হতে পারে না। তবে আমরা দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী। প্রহরীর দায়িত্ব হল, যদি রাজপুত্রও রাজদরবারে প্রবেশ করতে চায়, কিন্তু তার নিকট প্রবেশপত্র না থাকে, তাহলে বাঁধা প্রদান করবে। অথচ প্রহরী জানে আমি একজন প্রহরী আর ইনি শাহজাদা। কিন্তু তার দায়িত্ব হচ্ছে, অনুমতি ছাড়া রাজপুত্রকেও প্রবেশ করতে না দেয়া। তদ্রুপ আমরাও। আমরা দ্বীনের ঠিকাদার নই। আমরা দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী, আমাদের কাজ পরিচ্ছন্ন করা, আমরা আপনাকে সম্মান করব। তবে প্রহরী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আপনাকে বলা যে, আপনার এ কাজ ঠিক নয়।

১৩০-১৩৮

হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রাহ.এর

মালফূযাত

এসব তাবলীগি জামাতের চলাফেরা মেহনত ও কোশেশের দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে কেবল দ্বীনের তলব ও কদর পয়দা করা যাবে। এ দ্বারা তাদেরকে দ্বীন শিখতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে। পরবর্তীতে তাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়া ও তারবিয়াত বা আত্মশুদ্ধির কাজ উলামা ও বুযুর্গদের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। এ কারণেই আপনাদের মত বুযুর্গদের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ প্রদান একান্ত জরুরি।.............

আমাদের এ তাবলীগি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল 'উম্মতকে রাসূল সা. আনীত ইসলামের সকল ইলমি ও আমলি নেযামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। আর জামাতসমূহের চলাফেরা, তাবলীগি গাশত ইত্যাদি হল ওই উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম।..............

তাই পড়ানোর চেয়ে আমাদেরকে এ বিষয়ে বেশি চিন্তা ফিকির ও চেষ্টা করতে হবে যে, ছাত্ররা ফারিগ হয়ে যেন দ্বীনের খেদমতে লেগে থাকে এবং ইলমে দ্বীনের হক আদায় করে। নিজের জমিনে কোনো কিছু পয়দা না হওয়াও ক্ষতি। কিন্তু পয়দা হয়ে দুশমনের কাজে আসা আরো মারাত্মক ক্ষতির কথা।.............

হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রাহ. এর

মালফূযাত

১. উলামায়ে উম্মতের দায়িত্ব

পূর্বেকার নবীদের উম্মতের সাধারণ অবস্থা এই ছিল যে, তারা নুবুওয়াতের সময়কাল থেকে যত দূরে সরতে থাকত, দ্বীনি বিষয়-এবাদত ইত্যাদি-আপন রূহ ও হাকিকত থেকে ততো খালি হয়ে রসম ও রেওয়াজে পরিণত হত। তখন এগুলো চলে আসা রসম হিসাবেই পালিত হত। এমন পথভ্রষ্টতা ও বিপথে পরিচালিত হওয়ার সময় আরেকজন নবী প্রেরিত হতেন। যিনি ওই রসমের অবস্থা থেকে বের করে সেই উম্মতকে দ্বীনি বিষয়ের হাকিকত ও শরীয়তের আসল রূহের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

সর্বশেষ রাসূল সা. যখন প্রেরিত হন, ওই সময়ের যেসব জাতি গোষ্ঠীর সম্পর্ক আসমানী কোনো না কোনো ধর্মের সাথে ছিল তাদের অবস্থাও এমন ছিল যে, নিজেদের নবীদের আনীত ধর্মের যে অংশ তখনো তাদের কাছে অবশিষ্ট ছিল এগুলোর অবস্থাও রূহবিহীন কয়েকটি রসমের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। ওই রসমগুলোকে তারা আসল দ্বীন ও শরীয়ত মনে করত। রাসূল সা. এসে ওই রসমগুলোকে মিটিয়ে দ্বীনের মূল হাকিকত ও আহকাম শিক্ষা দেন।

বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মদি ও এ রোগে আক্রান্ত। উম্মতে মুহাম্মদির এবাদত পর্যন্ত রসম হয়ে গেছে। দ্বীনের তালীম যা এসব খারাবির সংশোধনের মাধ্যম হওয়ার কথা ছিল, তাও অনেক স্থানে রসম বনে গেছে।

যেহেতু নুবুওয়াতের সিলসিলা শেষ হয়ে গেছে। আর এসব সংশোধনের যিম্মাদারি উলামায়ে কেরামের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে; যাঁরা হলেন নায়বে নবী। তাই এখন তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব হল ওইসব গুমরাহী ও খারাপ অবস্থার সংশোধনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া। এর পদ্ধতি হল 'নিয়ত সহীহ করা'। কারণ দ্বীনি বিষয় তখনই রসম বা আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয় যখন এগুলোতে লিল্লাহিয়াত ও শানে আবদিয়ত থাকে না। নিয়ত সহীহ হয়ে গেলে তখন আমল সহীহ হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তখন আমলে আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে হাকিকত পয়দা হয় এবং প্রত্যেক আমল আবদিয়ত ও আল্লাহর এবাদতের জযবা থেকেই করা হয়।

মোটকথা, মানুষকে নিয়ত সহীহ করার প্রতি মনোযোগী করে তাদের আমলে লিল্লাহিয়ত ও হাকিকত পয়দা করার চেষ্টা করা উলামায়ে উম্মত ও দ্বীনের দায়িত্বশীলদের বর্তমান সময়ের এক বিশেষ ফরয ও কর্তব্য।

২. পীর-মুরিদির উদ্দেশ্য

তরীকত বা পীর মুরিদির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ পাকের আহকাম ও নির্দেশাবলি পছন্দনীয় হওয়া আর নিষেধাবলি অপছন্দনীয় হয়ে যাওয়া। (অর্থাৎ এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া যে আল্লাহর নির্দেশাবলি ও শরীয়তের আহকামাদি পালনে লযযত, স্বাদ ও আনন্দ পাওয়া, আর নিষেধাবলির কাছে যেতে কষ্ট ও খারাপ লাগা।) এটাই হল তরীকতের মূল উদ্দেশ্য। অন্য সবকিছু (অর্থাৎ বিশেষ পদ্ধতির যিকির ও নির্ধারিত তাসবীহ, তাহলীল প্রচেষ্টা ইত্যাদি) হল উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ লোক ওই মাধ্যমগুলোকেই আসল মাকসাদ মনে করে নিয়েছে। অথচ মাধ্যমের কোনো কোনোটি তো বেদআত।

মোটকথা, এগুলো যেহেতু কেবল মাধ্যম, মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই অবস্থা ও সময়ের চাহিদার ভিন্নতার কারণে এগুলোতে চিন্তা ফিকির করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা জরুরি। তবে যেসব জিনিস শরীয়তের অকাট্য বিষয় সেগুলো সর্বকালে একইভাবে ওয়াজিবুল আমল (আমল করা ওয়াজিব) থাকবে।

৩. দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ফরয কোনটি?

ফরযের অবস্থান নফলের চেয়ে অনেক অনেক উপরে; বরং নফল দ্বারা তো ফরযের পরিপূর্ণতা ও এর ত্রুটিসমূহের ক্ষতিপূরণই উদ্দেশ্য। মোটকথা, ফরযসমূহ হচ্ছে আসল আর নফলসমূহ হচ্ছে এগুলোর শাখা-প্রশাখা ও অধীনস্ত। কিন্তু কোনো কোনো লোকের অবস্থা এমন যে, তারা ফরযসমূহ থেকে গাফেল আর নফলসমূহে মশগুল। তারা নফলসমূহের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেমন আপনারা জানেন যে, دعوة إلى الخير বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ অর্থাৎ তাবলীগে দ্বীনের সকল শাখা প্রশাখা হচ্ছে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ফরযসমূহ থেকে। অথচ ক'জন আছেন যারা এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। তবে নফল যিকির আযকারে মশগুল ও মনোযোগী লোকের সংখ্য কি এ পরিমাণ কম?

৪. استغناء (ইসতেগনা) এর অর্থ

অনেক দ্বীনদার ও আলিম استغناء বা মুখাপেক্ষীহীনতা সম্পর্কে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত। তারা মনে করেন استغناء এর চাহিদা হল ধনী ও মালদারদের সাথে মোটেই না মেলা এবং তাদের থেকে সম্পূর্ণ দূরত্ব বজায় রেখে চলা। অথচ استغناء এর অর্থ হল কেবল এই যে, ধনীদের মালের প্রতি আগ্রহী হয়ে তাদের কাছে না যাওয়া। মাল ও সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে মেলামেশা না করা। কিন্তু তাদের ইসলাহ বা সংশোধন এবং দ্বীনি উদ্দেশ্যে তাদের কাছে যাওয়া ও সম্পর্ক রাখা মোটেই استغناء বিরোধী নয়; বরং এটা তো স্বস্থানে জরুরি। তবে এ ব্যাপারে খুবই হুঁশিয়ার ও সতর্ক থাকবে যে, তাদের সাথে মেলামেশার কারণে নিজের মধ্যে যেন মাল ও সম্মানের আগ্রহ পয়দা না হয়।

৫. মাদরাসাসমূহের ত্রুটি

বেশিরভাগ মাদরাসায় এ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যে, ছাত্রদেরকে তো পড়িয়ে দেয়া হয় ঠিকই, কিন্তু একথার প্রতি বিশেষ খেয়াল দেয়া হয় না যে, এ পড়া পড়ানো দ্বারা যে জিনিস আসল মাকসাদ (অর্থাৎ দ্বীনের খেদমত ও আল্লাহর পথে আহবান।) তারা পড়ার পর যেন এতে লেগে যায়। এ অনোযোগিতার ফল এই হয় যে, ওইসব মাদরাসার অনেক সম্ভাবনাময় ফাযিল ফারিগ হওয়ার পর জীবিকা নির্বাহকে টার্গেট বানিয়ে হয়ত হেকিমি পড়তে লেগে যায় নতুবা সরকারি কলেজ ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিয়ে সরকারি চাকুরিতে লেগে যায়। তারা দ্বীনি শিক্ষায় যে সময় ও টাকা ব্যয় করেছে, যে কষ্ট করেছে ফলাফলের দিক থেকে তা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। অনেক সময় এরা দ্বীনের শত্রুদের কাজে আসে।

তাই পড়ানোর চেয়ে আমাদেরকে এ বিষয়ে বেশি চিন্তা ফিকির ও চেষ্টা করতে হবে যে, ছাত্ররা ফারিগ হয়ে যেন দ্বীনের খেদমতে লেগে থাকে এবং ইলমে দ্বীনের হক আদায় করে। নিজের জমিনে কোনো কিছু পয়দা না হওয়াও ক্ষতি। কিন্তু পয়দা হয়ে দুশমনের কাজে আসা আরো মারাত্মক ক্ষতির কথা।

৬. ইলমের চাহিদা কী?

ইলমের সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল নিজের যিন্দেগির হিসাব করা নিজের দায়িত্ব ও ত্রুটিসমূহকে বুঝা এবং এগুলো পালনের ফিকির ও চেষ্টায় লেগে যাওয়া। কিন্তু এটা রেখে যদি আলিম আপন ইলম দ্বারা অন্যদের আমলের হিসাব নিকাশ নিতে লাগে। অন্যদের ত্রুটিসমূহ গণনার কাজে লেগে যায় তাহলে তো এটা হবে ইলমি কিবির ও অহঙ্কার। যা ইলমওয়ালাদের জন্য বড়ই ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর। কবি বলেন, নিজের কাজ করো, অন্যের দিকে দেখো না।

৭. মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন দেয়া হয় না?

মুসলমানদের হুকুমাত ও শাসনভার কেন দেয়া হয় না? এ প্রশ্নের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর আহকাম ও আদেশ নিষেধ তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেই পালন করছ না। (যেখানে তোমাদের অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে এবং কোনো বাঁধা নিষেধ নেই) তাহলে দুনিয়ার দায় দায়িত্ব কেমন করে তোমাদের হাতে ন্যস্ত করা হবে।

মুমিনদেরকে দুনিয়ার শাসনভার আল্লাহ এ উদ্দেশ্যে দেন যে, তারা যেন আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে জমিনে প্রতিষ্ঠা করে। তোমরা যখন আজ নিজেদের স্বাধীন সীমায় তা বাস্তবায়ন করছ না, তাহলে হুকুমাত তোমাদের হাওয়ালা করলে আগামীতে তোমরা তা বাস্তবায়ন করবে বলে কী আশা করা যায়?

৮. একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব

তাবলীগের আদবসমূহের মধ্য থেকে একটি হল এই যে, কথা বেশি লম্বা না হওয়া। প্রথম প্রথম মানুষের কাছে এ পরিমাণ আমল চাইবে যাকে তারা খুব ভারী ও মুশকিল

মনে না করে। কারণ কোনো সময় লম্বা কথা ও বড় রকমের চাওয়া মানুষের কাজ থেকে বিমুখ হওয়ার কারণ হয়ে যায়।

৯. বন্দেগি কাকে বলে?

মানুষ আজ আল্লাহর বন্দেগিকে চাকরি থেকেও কম মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। গোলাম ও কর্মচারীদের অবস্থা তো হল এই যে, তারা সর্বদা আপন মালিকের কাজে লেগে থাকাকেই নিজের দায়িত্ব মনে করে। আর এতেই তারা দৌড় ঝাঁপ করে। কাজের ফাকে যা কিছু পায় পানাহার করে নেয়। কিন্তু আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাদের অবস্থা তো হল এই যে, তারা কেবল নিজেদের কাজ ও পছন্দনীয় বিষয়েই লেগে থাকে। তবে কখনো কখনো নিজের ব্যক্তিগত কাজ ও ব্যস্ততার ভিতর থেকে কিছু সময় বের করে আল্লাহর কোনো কাজ করে নেয়। যেমন নামায পড়ে নেয় অথবা কোনো নেক কাজে চাঁদা দিয়ে দেয়। আর তখন মনে করে যে, আল্লাহ ও দ্বীনের চাহিদা পূর্ণ হয়ে গেছে।

অথচ আসল বন্দেগি হচ্ছে এই যে, দ্বীনের কাজ হবে আসল ও উদ্দেশ্য হিসাবে, আর খানাপিনা ও এর ব্যবস্থাপনা হবে আনুষাঙ্গিক হিসাবে। (এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ নিজের জীবন ধারনের সকল উপকরণ ও ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে শুধু দ্বীনের কাজে লেগে যাবে; বরং অর্থ হচ্ছে- সবকিছুই যেন বন্দেগির অধীনে হয়। বান্দার সব কাজ যেন দ্বীনের খেদমত ও সাহায্যকল্পেই হয়। আর নিজের খানাপিনা ইত্যাদি যেন আনুষাঙ্গিক হয়। যেমন মনিবের কাজকর্মে ব্যস্ত থেকে একজন গোলামের হয়ে থাকে।

১০. তাবলীগি আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী?

আমাদের এ তাবলীগি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল 'উম্মতকে রাসূল সা. আনীত ইসলামের সকল ইলমি ও আমলি নেযামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। আর জামাতসমূহের চলাফেরা, তাবলীগি গাশত ইত্যাদি হল ওই উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম। আর কালেমা, নামাযের শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে আমাদের পূরা নেসাবের আলিফ,বা,তা অর্থাৎ ক,খ,গ মাত্র। একথা পরিস্কার যে, আমাদের কাফেলাসমূহ পূর্ণ কাজ করতে পারবে না। তাদের কাজ শুধু এতটুকু যে, প্রত্যেক জায়গায় পৌঁছে আপন মেহনত মোজাহাদা দ্বারা একটি আলোড়ন ও চেতনার সৃষ্টি করবে। গাফেলদেরকে অনুপ্রাণিত করে স্থানীয় দ্বীনদারদের সাথে মিলিয়ে দেবে। ওখানকার স্থানীয় আলিম উলামা ও বুযুর্গদেরকে সাধারণ মুসলমানদের ইসলাহের কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। প্রত্যেক জায়গায় তো আসল কাজ স্থানীয় দ্বীনদাররা করতে পারবে। সাধারণ মানুষ তো স্থানীয় দ্বীনদারদের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে অধিক উপকৃত হতে পারবে। তবে এর পদ্ধতি আমাদের ওইসব লোকজন থেকে শিখতে হবে। যারা দীর্ঘদিন থেকে তাবলীগি মেহনত ও শিক্ষা দীক্ষার কাজে নিয়োজিত এবং বহুলাংশে তা আয়ত্ব করে নিয়েছে।

১১. একটি মারাত্মক ভুল

কত বড় একটি ভুল প্রচলন হয়ে গেছে যে, অন্য লোক আমাদের কথা মেনে নিলে এটাকে আমরা নিজেদের কামিয়াবি মনে করি আর না মানলে নিজেদের না-কামি মনে

করি। অথচ এ রাস্তায় এমন খেয়াল করাটাই ভুল। অন্যের মানা না মানা তো হচ্ছে তাদের কাজ। তাদের কোনো কাজের দ্বারা আমরা সফল বা বিফল হব কেন? আমাদের কামিয়াবি তো হল নিজের কাজ পূর্ণ করা। এখন তারা না মানলে তা তো তাদের নাকামি। তারা না মানলে আমরা কেন অকৃতকার্য হব।

আমরা অন্যকে মানানো– যা মূলত আল্লাহর কাজ– কে নিজের কাজ ও নিজের যিম্মাদারি মনে করে নিয়েছি। অথচ আমাদের একমাত্র যিম্মাদারি হল উত্তম ও সঠিক নিয়মে নিজের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। অন্যকে মানানোর কাজ তো নবীদের উপরও সোপর্দ করা হয়নি।

তবে কেহ না মানলে মনে করতে হবে যে, সম্ভবত আমাদের চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রয়েছে। আমরা আমাদের হক পূর্ণ আদায় করতে পারিনি; ফলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ প্রতিফল দেখিয়েছেন। এরপর আরো বেশি বেশি চেষ্টা করতে থাকবে এবং আল্লাহর কাছে দুআ ও তাওফিক চাইতে থাকবে।

১২. আসল কাজ এখনো শুরু হয়নি

মানুষ তাবলীগি কাজের বরকত দেখে মনে করে যে, কাজ খুব হচ্ছে, অথচ কাজ এক জিনিস আর বরকত অন্য জিনিস। দেখ, নবী করীম সা. এর জন্মের সাথে সাথেই বরকত প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু কাজ অনেক পরে শুরু হয়। এভাবে এখানেও বুঝে নাও আমি সত্যি বলছি যে, আসল কাজ এখনো শুরু হয়নি। যেদিন শুরু হবে সেদিন মুসলমানরা সাতশত বছর আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। আর যদি আসল কাজ শুরু না হয়ে কাজ এ পর্যায়ে থাকে যেভাবে এখন আছে। আর যদি লোকেরা এটাকে অন্যান্য আন্দোলনের ন্যায় একটি আন্দোলন মনে করে এবং এর কর্মীরা ভ্রান্তপথে চলতে থাকে, তাহলে যে ফেতনা ফ্যাসাদ শত শত বৎসর পর আসার কথা ছিল তা কয়েকমাসে এসে যাবে। তাই বিষয়টিকে ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে।

১৩. দয়া ও অনুগ্রহের কারণ কী হওয়া উচিত?

একবার বলেন, হাদীসে এসেছে من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 'যে দয়া করে না, তাকেও দয়া করা হয় না। জমিনওয়ালাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, তবে আসমানওয়ালা (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।

কিন্তু বড়ই আফসূসের বিষয় যে, মানুষ এ হাদীসকে শুধু ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তদের প্রতি দয়ার ব্যাপারে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে, তাই ভূখানাঙ্গা লোক দেখলে তাদের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য করে।কিন্তু মুসলমানদের দ্বীন থেকে মাহরূমী ও বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে দয়া ও অনুগ্রহ দেখানো হয়না। মানুষ যেন দুনিয়ার মুসিবত ও ক্ষতিকেই ক্ষতি মনে করে, দ্বীনের মুসিবত ও ক্ষতিকে যেন ক্ষতি মনে করে না। কাজেই আসমানওয়ালা কেমন করে আমাদের উপর রহম ও দয়া করবেন? যখন আমরা মুসলমানদের দ্বীনি বরবাদির উপর রহম করয়ী না!

দ্বীনি বরবাদির উপর রহম করার উপরই আমাদের এ তাবলীগের বুনিয়াদ। তাই এ কাজ দয়া ও মেহেরবানি দ্বারা হতে হবে। মুবাল্লিগ যদি আপন ভাইয়ের দূরাবস্থা

দেখে ব্যথিত হয়, তাহলে নিশ্চয় সে দয়া ও মেহেরবানির দ্বারা তাবলীগের কাজ করতে থাকবে। তবে উদ্দেশ্য যদি অন্য কোনো কিছু হয়, তাহলে অহঙ্কার ও আত্মগরিমায় লিপ্ত হবে। যা দ্বারা লাভের কোনো আশা করা যায় না। এ হাদীস সামনে রেখে তাবলীগ করবে, এর মধ্যে এখলাস পয়দা হবে। তখন নিজের দোষের উপর নজর পড়বে। অন্যের দোষক্রটি নজরে পড়লেও তাদের ইসলামি সৌন্দর্যগুলোর প্রতিও নজর পড়বে। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি নিজের নফসের তাবেদারী না করে আত্মসমালোচনায় লিপ্ত হবে। তাবলীগের সার হল এই যে, নিজের গুণের দিকে না তাকিয়ে সর্বদা নিজের দোষ-ক্রটি দেখার সবক গ্রহণ করবে।

১৪. ডাকার অপেক্ষা করা যাবে না

নবীয়ে করীম সা. ইসলামের প্রাথমিক যুগে (যখন দ্বীন দুর্বল ছিল আর দুনিয়া ছিল সবল) মানুষ তাঁকে না ডাকলেও মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে, তাদের মজলিস ও বৈঠকসমূহে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। কারো ডাকার অপেক্ষা করতেন না। কোনো কোনো স্থানে সাহাবায়ে কেরামকে তাবলীগ করার জন্য নিজ থেকে পাঠাতেন। বর্তমান সময়ে দ্বীনের ওই দুর্বল অবস্থা। তাই ডাকার অপেক্ষা না করে আমাদেরকে মানুষের দ্বারে দ্বারে, ঘরে ঘরে যেতে হবে। গুনাহগার ও খোদাদ্রোহীদের মজমায় গিয়ে হকের আওয়াযকে বুলন্দ করতে হবে।

১৫. ইলম ও আমল কী?

ইলমের দ্বারা আমল আর আমলের দ্বারা যিকির পয়দা হওয়া উচিত। এরকম হলেই ইলমকে ইলম আর আমলকে আমল বলা হয়। ইলম দ্বারা আমল পয়দা না হলে তা সরাসরি অন্ধকার। আর আমল দ্বারা অন্তরে আল্লাহর যিকির পয়দা না হলে তা নিরর্থক। আবার ইলম ব্যতীত যিকিরও ফিতনা।

১৬. দু'টি মহাবিপদ

দোস্ত! এখনো কাজের সময় বাকি। অচিরেই দ্বীনের উপর দু'টি মহাবিপদ আসবে–

প্রথম. শুদ্ধি আন্দোলনের ন্যায় কুফরি প্রচারের চেষ্টা সাধারণ মূর্খ লোকের মধ্যে করা হবে।

দ্বিতীয়. ইলহাদ বা নাস্তিকতা। যা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রাজনীতির সাথে আসছে। এ দুই প্রকার গোমরাহী প্লাবনের ন্যায় আসবে। যা কিছু করার এগুলো আসার পূর্বেই করে নাও।

১৭. শিক্ষা দীক্ষার পদ্ধতি

দ্বীনের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে যে তরীকা আমরা তাবলীগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত করতে চাই তা হচ্ছে রাসূল সা. এর যামানায় প্রচলিত তরীকা। পরবর্তীতে এব্যাপারে যেসব তরীকা আবিস্কৃত হয়েছে যেমন কিতাব লেখা, কিতাবি

শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি সাময়িক প্রয়োজনের সৃষ্টি। অথচ লোকেরা বর্তমানে এগুলোকেই আসল মনে করে নিয়েছে। আর রাসূল সা. এর যামানার তরীকাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। অথচ আসল তরীকা ছিল ওটাই। ব্যাপকভাবে শিক্ষা-দীক্ষা কেবল ওই তরীকায়ই দেয়া যেতে পারে।

১৮. তিন ধরনের লোকের কাছে যেতে হবে

তাবলীগি কাজ করনেওয়ালাদের তিন ধরনের লোকের কাছে তিন উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে যাওয়া উচিত :

১. উলামা ও বুযুর্গদের কাছে দ্বীন শেখার ও দ্বীনের ভাল তাছীর হাসিল করার জন্য।

২. নিজের থেকে নিচের মানুষের কাছে দ্বীনি কাথাবার্তা প্রচারের মাধ্যমে নিজের দ্বীনকে মজবুত ও পরিপূর্ণ করার জন্য।

৩. বিভিন্ন ধরনের লোকের কাছে গিয়ে তাদের উত্তম গুণাবলী গ্রহণ করার জন্য।

১৯. মিশ্রিত দল থাকা চাই

তাবলীগের সাথে সম্পর্কিত মিশ্রিত এমন একদল এখানে থাকা জরুরি, যে দলে প্রত্যেক তবকার লোক থাকবে। আহলে ইলমও থাকবে, আহলে যিকিরও থাকবে, ইংরেজি শিক্ষিত লোকও থাকবে, ব্যবসায়ীও থাকবে। এছাড়া গরিব সাধারণ মুসলমানও থাকবে। এদ্বারা আমাদের কাজের তরীকা বুঝার ও বাস্তবে একাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে বড় সাহায্য হবে। আর আমরা বিভিন্ন তবকার সংমিশ্রণ ও পরস্পরে সহযোগিতার যে পরিবেশ গড়তে চাই– ইনশাআল্লাহ এরও ভিত্তি স্থাপিত হবে।

২০. একটি ভুল ধারণা

আজকাল দ্বীনের ব্যাপারে সকলের মধ্যে একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে– তা এই যে, প্রাথমিক কাজগুলোকে শেষ পর্যায়ের আর মাধ্যমসমূহকে উদ্দেশ্যের মর্যাদা দেয়া হয়। চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, দ্বীনের প্রতিটি বিভাগে এ ভুল ধারণা প্রবেশ করেছে। যা হাজার হাজার খারাবি ও ভ্রান্তির মূল।

২১. নফস ও শয়তানের ধোঁকা

মানুষের স্বভাব নৈরাশ্যের দিকেই বেশি চলে। কারণ মানুষ নিরাশ হয়ে যাবার পর নিজেকে কাজের যিম্মাদার মনে করে না। ফলে তার থেকে আর কোনো কাজ হয় না। ভাল করে বুঝে নাও যে, এটাও নফস ও শয়তানের একটি বিরাট ধোঁকা।

২২. আল্লাহর নজর থেকে পড়ার কারণ

একটি দ্বীনি মাদরাসার জনৈক বিখ্যাত উস্তাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনারা তো আল্লাহর নজর থেকে পড়ে গিয়েছেন, যার ফলে মানুষের নজরেও হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন। এর বিশেষ একটি কারণ হল এই যে, আল্লাহ ও রাসূল সা. এর সাথে সম্পর্কের ইযযত ও গুরুত্ব আপনাদের কাছে নাই। পক্ষান্তরে দুনিয়াবি ও বস্তুবাদি সম্পর্ককে আপনারা অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। দেখুন! আমার ও

আপনার সম্পর্ক হল একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে। আমি তোমাকে ডেকেছিলাম কিন্তু তুমি আসনি। কিন্তু অমুক সম্পদশালী ব্যক্তি চিঠির মাধ্যমে ডাকার পরও এসে গেলে। (তার মধ্যে শুধু এ জিনিস বেশি যে, সে সম্পদশালী। তার কাছ থেকে এবং তার মাধ্যমে চাঁদা পাওয়া যায়) এটাই হচ্ছে আমাদের আসল রোগ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কথা বলা হলে তা শোনাও হয় না এবং মানাও হয় না।

২৩. মুসলমানদের তিনটি তবকা

আমাদের এ তাবলীগি আন্দোলন দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষা প্রচার প্রসার ও দ্বীনি যিন্দেগি ব্যাপক করার আন্দোলন। এ আন্দোলনের যেসব নিয়মনীতি রয়েছে এগুলো যথাযথ পালন করার মধ্যেই কামিয়াবির রহস্য নিহিত। ওই সকল নিয়মনীতির মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি হল এই যে, মুসলমানদের যে তবকার জন্য আল্লাহ পাক যে হক রেখেছেন তা আদায় করে তার সামনে এ দাওয়াত পেশ করতে হবে।

মুসলমানদের মধ্যে তিনটি তবকা বা শ্রেণী রয়েছে :

১. অনুন্নত দরিদ্র শ্রেণী। ২. উন্নত ধনী শ্রেণী। ৩. উলামায়ে দ্বীন।

এদের সকলের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে তা একটি হাদীসে জমা করা হয়েছে। من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا، ولم يبجل علماءنا، فليس منا. 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না, আর বড়দের সম্মান করে না এবং আলিমদের ইযযত করে না– সে আমাদের দলভূক্ত নয়।'

কাজেই যারা (মান-সম্মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সামর্থ, কাজ-কাম ও বয়সে ছোট) তাদের অধিকার হল স্নেহ মমতা পাওয়ার। অর্থ, সামর্থ ও বয়সে যারা বড় তাদের হক হল সম্মান পাওয়ার। আর উলামায়ে দ্বীনের হক হল ইযযত পাওয়া। তাদের এসব হক আদায় করে তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। وأتوا البيوت من أبوابها 'ঘরগুলোতে দরজা দিয়ে এসো' অর্থাৎ নিয়মমত কাজ কর, অনিয়ম কর না।

২৪. যত করবে তত পাবে

একবার বলেন, এখন একথা বলা ছেড়ে দাও যে, তাবলীগের কাজে তিনদিন দাও, পাঁচদিন দাও অথবা সাতদিন দাও। শুধু একথা বল, রাস্তা এটাই, যে যত বেশি করবে তত বেশি পাবে। এর কোনে সীমা পরিসীমা নেই। রাসূল সা. এর কাজ সকল নবীর চেয়েও বেশি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর একদিন এক রাতের আমলকে হযরত উমর রাযি. অর্জন করতে পারেননি। কাজেই এর সীমারেখা কই? এটাতো স্বর্ণ-রৌপ্যের খনি, যতই খনন করবে ততই পাইতে থাকবে।

২৫. এরা আল্লাহর দান

সাধারণভাবে তাবলীগি কাজ করনেওয়ালারা বড় লোকদের এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের পিছনে লেগে যায় আর গরিব ও নিরীহ লোকেরা নিজে নিজে এসে গেলেও তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এটা হল মাল ও দুনিয়া পূজা। ভাল করে বুঝে

নাও যে, যারা নিজে নিজে তোমাদের কাছে এসেছে এরা হল আল্লাহর দান ও তাঁরই প্রেরিত লোক। আর যাদের পিছনে লেগে তোমরা এনেছ, তারা হল তোমাদের উপার্জিত। অতএব যা আল্লাহর খালিস দান তার কদর নিজের কামাই থেকে বেশি হওয়া চাই। নিঃস্ব ও গরীব যেসব মেওয়াতি এখানে পড়ে থাকবে তাদের কদর কর। একটু চিন্তা করে দেখ রাসূল সা. কি দুআ করেছেন- اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন হিসাবে জীবিত রাখো, মিসকীন অবস্থায়ই আমাকে মৃত্যু দাও আর কিয়ামত দিবসে আমাকে মিসকীন হিসাবেই উঠাবে'।

২৬. তাঁদের প্রতি বদগুমান করবে না

যদি কোথাও দেখা যায় যে, ওখানকার ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন তাবলীগি কাজের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি দিচ্ছেন না; তাহলে তখন তাঁদের প্রতি অন্তরে বিন্দুমাত্র বদগুমান করবে না; বরং একথা মনে করবে যে, এসব বুযুর্গদের কাছে এ কাজের হাকিকত এখনও প্রকাশ পায় নি। একথাও বুঝা উচিত যে, যেহেতু তাঁরা দ্বীনের খাস খাদেম তাই শয়তান আমাদের চেয়ে তাঁদের বড় শত্রু। কারণ যেখানে মাল আছে সেখানেই তো চোর আসে। সাথে এ কথা বুঝবে যে, দুনিয়াদারগণ নিকৃষ্ট দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে যখন এ কাজে লাগতে পারছে না, তখন কেমন করে দ্বীনদার লোকেরা তাঁদের দ্বীনের মহান কাজসমূহকে ছেড়ে সহজে এ কাজে জড়িত হবে। বুযুর্গগণ বলেছেন- নূরানি পর্দা অন্ধকার পর্দা থেকে অধিকতর ভয়াবহ।

২৮. নিজেকে হেদায়তকারী মনে করবে না

আমাদের তাবলীগের মূল উদ্দেশ্য হল- সাধারণ দ্বীনদার মুসলমানগণ উপরওয়ালা তবকা হতে দ্বীন হাসিল করবে আর নিচের তবকা ওয়ালাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবে। কিন্তু নিচওয়ালাদেরকে নিজের জন্য উপকারি মনে করবে: কারণ আমরা যতবেশি কালেমার প্রচার করব তা দাবারা আমাদের কালেমা অধিক কামেল ও নূরানি হবে। আর যত মানুষকে আমরা নামাযি বানাব এর দ্বারা আমাদের নামায কামেল হবে। অন্যের জন্য নিজেকে হেদায়তকারি মনে করবে না, কেননা হেদায়ত করনেওয়ালা একমাত্র আল্লাহ।

২৯.যা আরামে কিতাব পড়ে হাসিল হয় না

যে উচ্চ মর্যাদা রাসূল সা. আপন জীবন উৎসর্গ করে বরং প্রাণ বিসর্জনের অদম্য আগ্রহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে হাসিল করতে বলে গেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের রাস্তায় নিজেদেরকে মিটিয়ে হাসিল করেছেন; সেসব মর্যাদাসমূহকে তোমরা আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে কিতাব পড়ে হাসিল করতে চাও।

৩০. কাজের সঠিক পদ্ধতি

কাজ করার সঠিক পদ্ধতি হল এই যে, যেসব কাজ নিচের লোকদের দ্বারা করানো যায় তা তাদের দ্বারা করানো। নিচের পর্যায়ের লোক থাকা সত্ত্বেও উপর দরজার লোকেরা এতে লাগা মারাত্মক ভুল; বরং তা নেয়ামতের এক প্রকার না শুকরি এবং নিচের পর্যায়ের লোকদের উপর যুলুম।

১৪০-১৪৬

হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রাহ.এর

মালফূযাত

আমরা প্রচলিত নিয়মের ভিন্ন কোনো দলও তৈরি করিনি। যেভাবে নামায পড়ার জন্য বিভিন্ন তবকা ও পেশার মুসলমান এসে জুড়ে যায় এবং নামায থেকে অবসর হয়ে নিজ নিজ ঘরে ও পেশায় চলে যায়। এভাবেই আমরা আপনাদের সবাইকে বলছি যে, কিছু সময়ের জন্য নিজ নিজ ঘর এবং কাজ থেকে বের হয়ে এই মেহনত ও অভ্যাস করে নিন। অতঃপর আপন ঘর এবং কাজে ফিরে এসে ওই সমস্ত নিয়ম বা উসূল অনুযায়ী কাজে লেগে যান। আপনারা যদি এই কাজ মেহনত করে অর্জন করে ফেলেন, তাহলে পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীরা আপনাদের কাছ থেকে এই কাজ বা পদ্ধতি শেখার জন্য আসবে।................

আমরা এটা চাই না যে, বুখারি শরীফ পড়ানেওয়ালাকে আত-তাহিয়্যাতু শেখানোর কাজে লাগানো হোক। হাঁ, একথা অবশ্যই চাই যে, আত-তাহিয়্যাতু শেখানোর গুরুত্বও যেন বুখারি শরীফ পড়ানেওয়ালাদের কাছে এসে যায়। কেননা, এটাও রাসূল সা. এর ইলমসমূহের মধ্যে একটি। এটাকে গুরুত্ব না দেয়া লোক কোনো কাজের হবে না। আর এটাও চাই যে, শিক্ষার নিম্নতম দরজাও দক্ষ বুখারিওয়ালাদের ছত্রছায়ায় যেনো হয়।................

আমরা তো পড়ানোকে বুনিয়াদি কাজ মনে করি, আর সত্য কথা এই যে, আমি নিজেই পড়াই। আমরা তো এটা চাই যে, পড়ানোর কাজের সাথে তাবলীগকেও লাগিয়ে রাখা হোক।.............

হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রাহ. এর

মালফূযাত

১. নিজের মধ্যে সূর্যের গুণাবলী সৃষ্টি করো

তোমরা পৃথিবীতে সূর্যের মতো আলো নিয়ে ঘুরাফেরা কর, তাহলে তোমাদের কাছ থেকে আলো প্রসারিত হবে। আর তোমাদের মধ্যে আলো আসবে ঈমানের দ্বারা এবং হজরত মুহাম্মদ সা.এর আনীত আমল ও আখলাক দ্বারা। এ ছাড়া খাঁটি নিয়তে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে।

সূর্যের মধ্যে তিনটি জিনিস রয়েছে :

এক. সে আলো নিয়ে ঘুরাফেরা করে।

দুই. সে অনবরত ঘোরে।

তিন. সে যাদেরকে আলো দেয়, তাদের কাছ থেকে কোনো বিনিময় নেয় না। তোমাদের অবস্থাও এটা হওয়া চাই। আলো নিয়ে ঘুরো এবং অনবরত ঘুরো। আর লোকদেরকে বল 'তোমাদের কাছে এর কোনো বিনিময় চাই না'। এ কথাকে নিজেদের মূলনীতি বা উসূল বানাও। দাওয়াতের আমল দ্বারা কোনো রকম উপকার হাসিল করো না।

২. এটা মুলক ও মালওয়ালা রাস্তা নয়

যাঁরা এখলাসের সাথে কুরবানি দিতে থাকবে, তাঁদের দিকে মুলক ও মালওয়ালারা একদিন খোদ ঝুঁকে পড়বে। ওই সময়টা অত্যন্ত পরীক্ষার হবে। তখন যদি দৃষ্টি তাদের মালের ওপর রেখে এ কথা মনে করা হয় যে, এখন মাল ও ক্ষমতা দ্বারা দ্বীনের কাজ চলবে, তাহলে সব করা কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি মুলক ও মাল থেকে দৃষ্টি হটিয়ে তাদেরকেও কুরবানির রাস্তায় লাগানো হয়, তখন আবার তাদের চেয়েও আরো বড়রা আসবে, ওদের সাথেও একই ব্যবহারই করতে হবে। এমনকি সরকার প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আসবে, তাদেরকেও এই রাস্তায়ই লাগাতে হবে। রাসূল সা. এর রাস্তা দাওয়াত এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার রাস্তা, মুলক ও মালের রাস্তা নয়।

৩. বস্তুর পরিবর্তে নিজের শরীরের ওপর মেহনত করবে

মানুষ পৃথিবীতে দু'টি বস্তুর ওপর মেহনত করে। প্রথম- দুনিয়ার বস্তুর ওপর, দ্বিতীয়- নিজের শরীরের ওপর। দুনিয়ার বস্তুসমূহের ওপর যেমন ঘর-বাড়ী, জমি-জমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারখানা ও চাকরি বাকরি ইত্যাদি। আর মানুষ যে জিনিসের ওপর মেহনত করে, পূরা মনোযোগ সে দিকে থাকে। অন্তর ওই সকল জিনিসের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, নিজের শরীরের পূর্ণতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মরার পর এ সকল জিনিসের ওপর কৃত মেহনত বেকার সাব্যস্ত হবে। মানুষ এই পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ খালি হাতে চলে যাবে। আর হাশরের মাঠে যখন নিজের

শরীরের ওপর মেহনতকারীদের দেখবে, তখন নিজের ওপর শুধু কাঁদবে, এতো কাঁদবে যে, অশ্রুর সাগর বয়ে যাবে।

৪. নিজেদের মধ্যে আখলাক না আসা পর্যন্ত অন্যদের মধ্যে দ্বীন প্রসার লাভ করবে না

যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর অস্তিত্বের ইয়াকিন এবং নুবুওয়াতি ইলম মোতাবেক এবাদত ঠিক হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আখলাক আসে না, আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আখলাক আসবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ভিন্নধর্মীদের মধ্যে দ্বীন ছড়াবে না। কোনো মতলবে কারো সাথে ভালো ব্যবহার করা আখলাক নয়; বরং এখলাস না থাকলে এর কোনো মূল্য হবে না। একদিন এক মজলিস থেকে উঠতে গিয়ে মুফতী যায়নুল আবেদীন সাহেবের কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন, 'মুফতী সাহেব! এখলাস ব্যতীত আমল মুরদারই তো বটে। আর দেখ! ঘরে-বাইরে, বাজারে-অফিসে, এমনকি মাদরাসা ও মসজিদসমূহেও এ ধরনের মুরদারের স্তূপ পড়ে আছে।

৫. আমরা প্রচলিত নিয়মের কোনো ভিন্ন দল তৈরি করিনি

আমরা এই কাজের জন্য কোনো মিলনায়তন তৈরি করিনি। না এর কোনো অফিস আছে, না রেজিস্ট্রি খাতা, না কোনো ফাণ্ড আছে। এটা সম্পূর্ণই সকল মুসলমানের কাজ। আমরা প্রচলিত নিয়মের কোনো ভিন্ন দলও তৈরি করিনি। যেভাবে নামায পড়ার জন্য বিভিন্ন তবকা ও পেশার মুসলমান এসে জুড়ে যায় এবং নামায থেকে অবসর হয়ে নিজ নিজ ঘরে ও পেশায় চলে যায়, এভাবেই আমরা আপনাদের সবাইকে বলছি যে, কিছু সময়ের জন্য নিজ নিজ ঘর এবং কাজ থেকে বের হয়ে এই মেহনত ও অভ্যাস করে নিন। অতঃপর আপন ঘর এবং কাজে ফিরে এসে ওই সমস্ত নিয়ম বা উসূল অনুযায়ী কাজে লেগে যান। আপনারা যদি এই কাজ মেহনত করে অর্জন করে ফেলেন, তাহলে পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীরা আপনাদের কাছ থেকে এই কাজ বা পদ্ধতি শেখার জন্য আসবে। আর আল্লাহ চাইলে আপনারা পৃথিবীর নেতা হবেন।

৬. সাথীদের খুবীগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকা চাই

খারাপ এবং দুর্বলতা থেকে কেউই মুক্ত নয়। যদি আল্লাহর ওলিকেও দেখ, তবুও কোনো না কোনো দুর্বলতা তাঁর মধ্যেও পাওয়া যাবে, যার কারণে তাঁর সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাই শুধু (পরের) খুবী দেখ, কারো গোপন জীবনের প্রতি নজর দিবে না, এগুলোর তালাশে পড়বে না।

৭. রাসূল সা.এর তরীকা ব্যতীত মাল-দৌলত পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রশান্তি কখনো পাওয়া যাবে না

যে ব্যক্তি জগতের স্রষ্টা ও রাসূল সা. কে জানা এবং মানা ব্যতীত বস্তুসমূহে প্রবেশ করে, তার অবস্থা চোর এবং ডাকাতের মতো। তাদের মাল দৌলত তো অর্জন হয়ে যেতে পারে, তবে প্রশান্তি ও প্রিয়তা কখনো পাওয়া যেতে পারে না। আর একথাও বলতেন যে, স্বয়ং জগতের স্থায়ীত্ব শুধু ওই সময় পর্যন্তই যতক্ষণ তার মধ্যে রাসূল

সা. এর আমল থাকবে। যখন রাসূল সা.এর আমলসমূহ থেকে একটা আমলও বাকী থাকবে না, তখন ওই মরা লাশকে দাফন করে দেয়া হবে।

৮. দাওয়াতি মেহনতের উদ্দেশ্য

তাবলীগের উদ্দেশ্য কোনো বিশেষ বস্তুর প্রচার নয়; বরং এর দ্বারা প্রতিটি ওই জিনিস জীবন্ত করা উদ্দেশ্য, যাকে রাসূল সা. মুসলমানদের কামিয়াবির জন্য নিয়ে এসেছেন। আর তা ধীরে ধীরে আমরা মুসলমানদের যোগ্যতা অনুযায়ী আমলের ওপর প্রয়োগ করতে থাকি। এসবের ভিত্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘর-বাড়ি ছাড়ার অভ্যাসকে সাধারণে পরিণত করা। এই ঘর-বাড়ী ছাড়ার অভ্যাস যতোটা সাধারণ হবে, আল্লাহ তাআলার রহমতের বৃষ্টিও সাধারণভাবে নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়ে যাবে।

৯. আলিমদের তাবলীগে কম শরীক হওয়ার কারণ?

কাজের গুরুত্ব যাদের মনে এসে যায় এবং কাজের অবস্থা ও রকম যাদের মনে এসে যায়, তারা এই কাজে শরীক হয়ে যায়। এর মধ্যে আলিম সমাজও আছেন, জনসাধারণও আছেন। যেহেতু আলিম সমাজের যিম্মায় দ্বীনের অন্যান্য কাজও ন্যস্ত, তাই তাঁরা এ কাজে কম শরীক হতে পারেন। আপনারা যাদেরকে পাঠাতে চাইবেন, আমরা তাঁদের শেখানো বোঝানোর ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করবো।

১০. সত্য অভাব-অনটন ও দারিদ্রের কষ্টসমূহের মধ্যে চমকায়

সকল নবী নিজ নিজ যামানায় কোনো না কোনো নকশা বা মতাদর্শের মোকাবালায় এসে বলেছেন, এই মতাদর্শের সাথে সফলতার মোটেও কোনো সম্পর্ক নেই। সফলতার সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সু-উচ্চ সত্তার সাথে। যদি আমল সঠিক হয়, আল্লাহ পাক ছোট আকৃতি বা নকশাঁর মধ্যেও কামিয়াব করে দেবেন। আর যদি আমল নষ্ট হয়, আল্লাহ পাক বড় থেকে বড় নকশাও ভেঙ্গে হতাশ করে দেখিয়ে দেবেন। প্রত্যেক নবী নিজের সময়কালে প্রচলিত মতাদর্শের মোকাবালায় মেহনত করেছেন। আর হজরত মুহাম্মদ সা. সকল গণতন্ত্র, শাসনক্ষমতা, মাল, ক্ষেত-ফসল ও কারিগরি নকশার মোকাবালায় তাশরীফ এনেছেন। রাসূল সা. এর মেহনত ওই সকল নকশার দ্বারা চলেনি, তাঁর মেহনত ত্যাগ-তিতিক্ষা ও মোজাহাদার ওপর চলেছে। বাতিল আরাম-আয়েশের উপকরণের নকশার মাধ্যমে ছড়ায়, আর সত্য কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার মাধ্যমে ছড়ায়। বাতিল মুলক ও মালের দ্বারা চমকায়, আর সত্য অভাব-অনটন ও দারিদ্রতার মধ্যে চমকায়। যতো ফেতনা মুলক ও মাল এবং আরাম-আয়েশের উপকরণের ভিত্তির উপর আমদানী করা হচ্ছে, তাদের ধ্বংস সত্যের জন্য অভাব-অনটন ও দারিদ্র এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার মধ্যে। এখন এই কাজের মাধ্যমে উম্মতের মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও মোজাহাদার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। এই কাজের ব্যাপারে বড় আশঙ্কা এই যে, একে নকশাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা। এর দ্বারা কাজের রূহ বের হয়ে যাবে। এই কাজের হেফাযত এর

মধ্যে যে, কাজ করনেওয়ালা এই কাজের জন্য সকল সহজ পদ্ধতিগুলোকেও কুরবান করে মোজাহাদাওয়ালা তরীকা কায়েম রাখবে। আর কোনো অবস্থাতেই মোজাহাদা ওয়ালা তরীকাকে শেষ হতে দেবে না। গরীবদের মধ্যে নিজেদের মেহনতকে বাড়াতে হবে। পায়দল জামাত চালাতে থাকবে। মানুষ আসবে এবং বলবে যে, নিন! আমাদের এই টাকা দ্বীনের কাজে খরচ করুন। তখন নকশার কুরবানি দেয়া লাগবে। তখন বলে দিতে হবে, জনাব একাজে খরচ করার সঠিক এবং পবিত্র পদ্ধতি ও জযবা শেখানো হয়। এরপর আপনি নিজেই পাত্র তালাশ করে খরচ করতে পারবেন। এখানে শুধু এই পদ্ধতি শিখে নিন।এই কাজের প্রচারের জন্য প্রচলিত পদ্ধতি-পত্র-পত্রিকা, ইশতেহার, প্রেস মিডিয়া ইত্যাদি এবং প্রচলিত শব্দাবলী থেকেও বেঁচে থাকা জরুরি। এই কাজ সম্পূর্ণ অপ্রচলিত। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রচলিত কাজের সাহায্য হয়, এই কাজের নয়। আসল কাজের আকৃতি দাওয়াত, গাশ্‌ত, তালীম, তাশকীল ইত্যাদি। পরামর্শের দরকার হলে, উপযুক্ত বন্ধুদের পৃথক করে পরামর্শ করে নেয়া চাই। এমন যেন না হয় যে, পরামর্শকারীরা কোনো সময়ই উমূমি আমল অর্থাৎ সমষ্টিগত কাজে জোড়তে পারে না।

১১. যাদের মধ্যে নেয়ার মানসিকতা, তাদের মধ্যে দেয়ার পদ্ধতি কিভাবে চলবে?

এখন বলা হয় যে, বর্তমান সময়ে ইসলাম চলতে পারে না, কথা তো সত্য, লওয়ার মন-মানসিকতা যাদের, তাদের মধ্যে দেয়ার পদ্ধতি কিভাবে চলবে? ইসলামকে নিজের মন চাহি মতে এবং নিজের অবস্থা অনুযায়ী বানিয়ে চালাতে চাইলে তো তা ইসলাম থাকবে না, তা তো তোমাদের বানানো একটি নতুন জিনিস হয়ে যাবে।

কেউ নকশা আঁকিয়ে ব্যক্তির কাছে বাঘের ছবি নিজের শরীরে আঁকাতে চেয়েছে, যখন সে সুঁই দিয়ে শরীরে আঁকা শুরু করলো এবং ব্যথা লাগলো, তখন আঁকিয়েকে বলল, কি বানাতে আছো? সে বললো, 'প্রথমে বাঘের লেজ বানাচ্ছি'। ওই ব্যক্তি বলল, 'লেজ থাক, লেজ ছাড়াও বাঘের ছবি হতে পারে'। সে লেজ বাদ দিলো এবং অন্য দিক থেকে আঁকা শুরু করল। এবার জানতে চাইল, এখন কি বানাচ্ছো? সে বলল, 'কান বানাচ্ছি' সে বলল, 'কান ছাড়াও বাঘের ছবি বানাতে পারো, তুমি কান বাদ দাও, কান ছাড়া বাঘের ছবি বানিয়ে দাও'। তো ভাই বন্ধুরা! এ অবস্থায়ই ইসলামের সাথে হচ্ছে। নিজের মেযাজ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামের ওপর চলা কষ্টকর হচ্ছে, তাই ইসলামের লেজ কাটা হচ্ছে এবং তাকে নিজের খাহেশ মোতাবেক বানানো হচ্ছে।

১২. ঈমান কোন জিনিসের নাম?

ঈমান প্রকাশ্য বস্তুর ওপর প্রকাশ্যভাবে ইয়াকিন করার নাম; বরং প্রকাশ্য ও প্রচলিত এবং মানুষের দেখার খেলাফ আল্লাহ জাল্লা জালালুহু-র সত্তা ও গুণাবলী এবং ওই ধরনের আমল ও খবরের ওপর ইয়াকিন জমিয়ে ফেলারই নাম ঈমান।

১৩. কুতুব এবং আবদাল হওয়ার রাস্তা

আমি যখন শৈশবে "মিয়ান-মুনশাইব" (একটি গ্রামারের বই) পড়তেছিলাম, তখন হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রহ. বলেন, ইউসুফ! তোমাকে কুতুব হওয়ার পথ বাতলে দেবো? আমি আরজ করলাম, হজরত বলে দিন। বললেন, ইউসুফ! যখন যেখানে রাসূলে আকরাম সা. এর সুন্নতের খেলাফ আমল হতে দেখবে, তার বিপরীত সুন্নতকে প্রচলন করার জন্য মেহনত কোনো জায়গা বা সময়ের শর্ত ছাড়াই করবে। এটা কুতুব এবং আবদাল হওয়ার রাস্তা।

১৪. ইসলামি সমাজব্যবস্থা কখন বাস্তবায়িত হবে?

আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, রাসূল সা. এর জীবন পদ্ধতি জীবনের প্রতিটি শাখায় জীবন্ত হোক এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার মর্জি মোতাবেক সমাজব্যবস্থার বিশুদ্ধিকরণ অস্তিত্বে আসুক। আর এই ব্যবস্থা ওই পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সমাজের যা ভিত্তি, তা অস্তিত্বে আসবে, অর্থাৎ কামিয়াবি আল্লাহর হাতে হওয়ার ইয়াকিন এবং রাসূল সা.এর তরীকার মধ্যে আল্লাহ থেকে কামিয়াবি নেয়ার সীমাবদ্ধতার ইয়াকিন, আর তাঁর শেখা-শেখানোর সাধারণ পরিবেশ যতক্ষণ পর্যন্ত কায়েম না হবে, সমাজ ব্যবস্থা ঠিক হবে না।

১৫. হযরতজি রাহ.এর আম্মাজানের শিক্ষাদান বা তরবিয়তের পদ্ধতি

আমার আম্মাজান আমার তরবিয়ত এভাবে করেছেন যে, কোনো মহিলা মেহমান যদি মিষ্টি অথবা কলা ইত্যাদি হাদিয়া হিসাবে আনতো, আর আমি এর দিকে তাকাতাম, তখন মেহমান চলে যাওয়ার পর আম্মাজান আমাকে পেটাতেন আর বলতেন, তুমি মিষ্টির দিকে মনোযোগ দিয়ে কেনো দেখলে?

১৬. আমরা এটা চাই না যে, বুখারি শরীফ পড়ানেওয়ালাদেরকে আত -তাহিয়্যাতু শেখানোর কাজে লাগাবো

দাওরা জামাতের ছাত্রদের কোনো এক মজলিসে হযরতজি বলেন, আমরা এটা চাই না যে, বুখারি শরীফ পড়ানেওয়ালাকে আত-তাহিয়্যাতু শেখানোর কাজে লাগানো হোক। হাঁ, একথা অবশ্যই চাই যে, "আত-তাহিয়্যাতু" শেখানোর গুরুত্বও যেন বুখারি শরীফ পড়ানেওয়ালাদের কাছে এসে যায়। কেননা, এটাও রাসূল সা. এর ইলমসমূহের মধ্যে একটি। এটাকে গুরুত্ব না দেয়া লোক কোনো কাজের হবে না। আর এটাও চাই যে, শিক্ষার নিম্নতম দরজাও দক্ষ বুখারিওয়ালাদের ছত্রছায়ায় যেনো হয়।

১৭. সমষ্টিগত অবস্থা বিগড়ে গেলে আওলিয়ায়ে কেরামের দুআও অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে না

সমষ্টিগত অবস্থা বিগড়ে যওয়ার পর যদি জাতির আল্লাহওয়ালারা তা শুধরাবার জন্য রাত্রে কেঁদে কেঁদে দুআ করেন, তখন তাঁদের দুআও অবস্থাকে ভালো বানাতে পারে না।

১৮. সুন্নত মোতাবেক পেশাব-পায়খানা করার মধ্যেও নূর আছে

বিজ্ঞ সুফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, সুন্নত মোতাবেক পেশাব-পায়খানা থেকে ফারেগ হওয়া ও পবিত্রতা অর্জন করার মধ্যে যে সকল নূর বিদ্যমান, পরবর্তীকালে দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বড় বড় বিভাগ বা শাখা-প্রশাখায়ও তা নেই।

১৯. আমরা মাদরাসায় পড়ানোকে বুনিয়াদি বা ভিত্তিমূলক কাজ মনে করি

একবার হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান বিননূরি সাহেব হযরতজির কাছে নিজের পড়ানোর কাজে ব্যস্ততার শেকায়েত করে আরয করলেন, আমি পড়াতে পড়াতে এতো বিরক্ত হয়ে গেছি যে, মন চায় যদি কাউকে পাওয়া যেতো তাহলে পড়ানোর দায়িত্ব তাঁর হাওলা করে কিছুদিন তাবলীগে সময় কাটাতাম। তখন হযরতজি বললেন, কখনো না, তাবলীগের আগেও এ কাজই করতে হবে এবং তাবলীগের পরেও এ কাজই করতে হবে। (অর্থাৎ পড়াতে হবে) মানুষ আমাদেরকে বলে যে, আমরা নাকি মাদরাসার বিরোধী, অথচ এটা ভুল কথা। আমরা তো পড়ানোকে বুনিয়াদি কাজ মনে করি, আর সত্য কথা এই যে, আমি নিজেই পড়াই। আমরা তো এটা চাই যে, পড়ানোর কাজের সাথে তাবলীগকেও লাগিয়ে রাখা হোক।

২০. খায়রুল কুরুনে পরিচিতি পদ্ধতি

খায়রুল কুরুনে পরিচিতির জন্য আমলকে হিসাবে নেয়া হতো যে, ইনি তাহাজ্জুদ গুজার, ইনি রাত জাগা লোক, ইনি সব সময় রোযা রেখে থাকেন।

২১. কামিয়াবি ধন-দৌলতের মধ্যে নয়

কামিয়াবি ধন-দৌলতের মধ্যে নয়, যদি টাকা-পয়সার মধ্যে কামিয়াবি হতো, তাহলে কারূন কামিয়াব হতো। কামিয়াবি আল্লাহর হাতে, তিনি কামিয়াব করতে চাইলে বিনা টাকা-পয়সায়ও কামিয়াব করতে পারেন, আর যদি তিনি নাকাম করতে চান, তাহলে ধন-দৌলতের মধ্যেও নাকাম করতে পারেন।

২২. হযরতজির আশা আকাঙ্ক্ষা

আমি চাই, প্রত্যেকটি ঘর যেন সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর ঘরের নমুনা মোতাবেক হয়ে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির সময়ের এক-তৃতীয়াংশ মদিনার সাহাবীদের নকশা মোতাবেক অতিবাহিত হোক।

২৩.এটমবোম দ্বারা ওটাই হবে যা আল্লাহ চাইবেন

এটমবোমকে ভয় পাওয়া এমন যেমন কাফির মুশরিকরা মূর্তিকে ভয় পেত এবং তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশাও করত। এটমবোম এবং এটমবোমের অধিকারীদের ঘাড়সমূহ কুদরতের হাতে অবনত। এটমবোম থেকে ওটাই হবে যা আল্লাহ চাইবেন। ফেরাউন বলল, 'এ সকল নদী আমার হুকমে প্রবাহিত হয়'। কিন্তু আল্লাহ পাক ওই পানিকেই তার ডোবার ও ধ্বংসের কারণ বানান।

২৪. ইলমের সঠিক ব্যবহার না হলে তা বরবাদির কারণ

একটি হচ্ছে- ইলম সহীহ হওয়া, আর আরেকটি হচ্ছে- ইলমের সঠিক ব্যবহার হওয়া। যদি ইলম সঠিক হয় আর এর ব্যবহার সঠিক না হয় তাহলে ইহা বরবাদির কারণ।

২৫.সর্বোত্তম ইবাদত

নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকির সর্বোত্তম ইবাদত, কিন্তু যে মেহনত দ্বারা দুনিয়া যিকিরকারী হবে তা এর চেয়েও বেশি উত্তম।

২৬.সাহায্য কখন আসে

সাহায্য ওই সময় আসে, যখন কোনো ব্যক্তির উপর দৃষ্টি থাকবে না। আর আল্লাহ পাকের বাতানো আমলের মধ্যে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী চেষ্টা করে দুআ করতে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফ ও মাওলানা তারিক জামিল-এর

সাক্ষাৎকার এবং একটি হাদীস

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমি প্রধানমন্ত্রী ভবনে গিয়েছিলাম।

সময়টা ছিল নওয়ায শরীফের জন্য একটি ক্রান্তিকাল।

তাঁর ক্ষমতার টালমাটাল অবস্থা।

অন্তহীন পেরেশানি বিরাজ করছিল তাঁর মনে।

আমি বলাম, জনাব! আযাব দুই রকম হয়ে থাকে।

জমিনি আযাব ও আসমানি আযাব।

জমিনি আযাব ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির লাভের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নানাবিধ পন্থা ঠিক করে দিয়েছেন।

কিন্তু আসমানি আযাব-গযবের একটিই মাত্র সমাধান।

তা হলো তাওবা।

আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করে বললাম, দুনিয়ার সমস্যা হলো পঁচিশটি। ব্যক্তি বলুন কিংবা জাতি বলুন, মানুষ জীবনে এই পঁচিশটি সমস্যারই শিকার হয়ে থাকে।

এই হাদীসে আল্লাহর রাসূল সা. এরই সমাধান দিয়েছেন।

হাদীসটি শুনে প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফ চমকে ওঠেন। সমস্যা ও সমাধান তাঁর সম্মুখে এমনভাবে পড়ে ছিল, যেমনিভাবে টেবিলে কফির পেয়ালা থাকে।

সমস্যা জর্জরিত প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফ আবেগের আতিশয্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মাওলানা, এই হাদীসটি আপনি আমার মন্ত্রীপরিষদকে শোনান; আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

আমি তাঁর আবেদন কবুল করলাম।

রাসূলে আরাবির সেই মহামূল্যবান হাদীসটি এই-

এক বেদুঈন নবীজি সা. এর দরবারে হাযির হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব।

নবীজি সা. বললেন, বল।

সে সময়ে নবীজির দরবারে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ ইবনে ওলীদও উপস্থিত ছিলেন।

বেদুঈন প্রশ্ন করতে শুরু করল আর নবীজি সা. তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন।

বেদুঈন : হে আল্লাহর রাসূল, আমি অভাবমুক্ত থাকতে চাই।

নবীজি সা. : অল্পে তুষ্ট থাকার চরিত্র অবলম্বন করো, তা হলে অভাবমুক্ত হয়ে যাবে।
বেদুঈন : আমি সবচেয়ে বড় আলিম হতে চাই।
নবীজি সা. : তাকওয়া অবলম্বন করো, বড় আলিম হয়ে যাবে।
বেদুঈন : আমি সম্মানিত হতে চাই।
নবীজি সা. :মাখলুকের সামনে হাত পাতা বন্ধ করে দাও, সম্মানিত হয়ে যাবে।
বেদুঈন : আমি ভালো মানুষ হতে চাই।
নবীজি সা. : মানুষের উপকার করো।
বেদুঈন : আমি ন্যায়পরায়ণ হতে চাই।
নবীজি সা. : নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অপরের জন্যও তা-ই পছন্দ করার চরিত্র সৃষ্টি করো।
বেদুঈন : আমি শক্তিশালী হতে চাই।
নবীজি সা. : আল্লাহর উপর ভরসা করো।
বেদুঈন : আমি আল্লাহর দরবারে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতে চাই।
নবীজি সা. : বেশি বেশি যিকির করো।
বেদুঈন : আমি জীবিকায় স্বচ্ছলতা কামনা করি।
নবীজি সা. : সব সময় অযু সহকারে থাকো।
বেদুঈন : আমি যখনই যে- দুআ করব, তা-ই যেন কবুল হয়।
নবীজি সা. : হারাম খাওয়া বর্জন করো।
বেদুঈন : আমি ঈমানের পরিপূর্ণতা কামনা করি।
নবীজি সা. : চরিত্রকে ভালো করে নাও।
বেদুঈন : কিয়ামতের দিন গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে চাই।
নবীজি সা. : গোসল ফরয হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোসল করে ফেলো।
বেদুঈন : গুনাহ হ্রাস করতে চাই।
নবীজি সা. : আল্লাহর সমীপে বেশি বেশি ক্ষমাপ্রার্থনা করো।
বেদুঈন : কিয়ামতের দিন নুরান্বিত হয়ে উঠতে চাই।
নবীজি সা. : যুলুম করা ছেড়ে দাও।
বেদুঈন : আমি কামনা করি, আল্লাহ আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন।
নবীজি সা. : তুমি আল্লাহর বান্দাদের উপর দয়া করো।
বেদুঈন : আমি চাই, আল্লাহ আমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন।
নবীজি সা. : তুমি মানুষের দোষ ত্রুটি গোপন রাখো।
বেদুঈন : আমি লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পেতে চাই।

নবীজি সা. : ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকো।

বেদুঈন : আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয় পাত্র হতে চাই।

নবীজি সা. : যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়ভাজন, তুমি তাঁদেরকে প্রিয় বানিয়ে নাও।

বেদুঈন : আমি আল্লাহর অনুগত হতে চাই।

নবীজি সা. : যথাযথভাবে ফরযসমূহ আদায় করো।

বেদুঈন : আমি ইহসানের অধিকারী হতে চাই।

নবীজি সা. :এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেন তুমি তাঁকে দেখছো কিংবা তিনি তোমাকে দেখছেন।

বেদুঈন : হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ জিনিস গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়?

নবীজি সা. : চোখের পানি, বিনয় ও রোগ।

বেদুঈন : কোন্ জিনিস জাহান্নামের আগুনকে ঠাণ্ডা করে দেয়?

নবীজি সা. : দুনিয়ার বিপদাপদে ধৈর্যধারণ।

বেদুঈন : কোন্ জিনিস আল্লাহর গোস্বাকে প্রশমিত করে?

নবীজি সা. : গোপনে দান করা আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

বেদুঈন : সবচেয়ে বড় মন্দ কী?

নবীজি সা. : অসচ্চরিত্রতা ও কৃপণতা।

বেদুঈন : সবচেয়ে বড় সদ গুণ কী?

নবীজি সা. : উত্তম চরিত্র, বিনয় ও ধৈর্য।

বেদুঈন : আমি আল্লাহর গোস্বা থেকে রক্ষা পেতে চাই।

নবীজি সা. : তুমি মানুষের উপর গোস্বা করা ছেড়ে দাও।

মাওলানা তারিক জামিল বলেন, হাদীসটি বর্ণনা করে আমি কেবিনেট সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বললাম-

আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করয়ী।
এমতাবস্থায় আমরা দুনিয়াবি সমস্যাবলি থেকে কীভাবে রক্ষা পাব?
আমরা জাতিগতভাবে অপচয়ের শিকার।
এমতাবস্থায় আমরা কীভাবে অভাবমুক্ত হব?
আমরা আল্লাহর মাখলুকের সামনে হাত পাতছি।
এমতাবস্থায় কীভাবে আমরা মর্যাদার অধিকারী হব?
আমরা সবসময় অযুবিহীন থাকছি।
এমতাবস্থায় কী করে আমরা স্বচ্ছল হব?
আমরা তাওয়াক্কুল অবলম্বন করয়ী না।
এমতাবস্থায় কী করে আমরা শক্তির অধিকারী হব?

আমরা চরিত্রহীন।
এমতাবস্থায় আমাদের ঈমান কী করে পূর্ণতা লাভ করবে?
আমরা আল্লাহর বান্দাদের অনুকম্পা করি না।
এমতাবস্থায় আল্লাহ কীভাবে আমাদের উপর রহম করবেন?
আমরা দান-সদকা করি না।
এমতাবস্থায় কীভাবে আমরা আল্লাহর গোস্বা থেকে রক্ষা পাব?

নওয়ায শরীফ জিজ্ঞেস করলেন, 'মাওলানা, এই অবস্থায় আল্লাহর রহমত লাভ করতে হলে আমাদের কী করা উচিত?'

আমি বললাম, নিজেরা আল্লাহর নিকট তাওবা করুন এবং দেশবাসীকে তাওবার আহবান জানান।

যারা চোখের পানি ফেলে ক্রন্দন করে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন।

শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বাস করুন, আপনি যে সমস্যার মোকাবালা করছেন, তা জমিনি নয়- আসমানি বিপদ। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য, তাঁর নির্দেশনা ও রহমত না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দেশ ঠিক হবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের কোনো সমস্যাই দূর হবে না।

নওয়ায শরীফ বললেন, 'মাওলানা, আপনি বক্তব্য লিখে দিন; আমি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেব এবং দেশবাসীকে তাওবার আহবান জানাব।'

মিটিং শেষ হয়ে গেল।
আমি বক্তব্য লেখা শুরু করলাম।
কিন্তু ইতোমধ্যে নওয়ায শরীফের পতন হয়ে গেল।..........................

সহায়ক গ্রন্থাবলি

❖ জিলাউল আযহান (আরবি) - মাওলানা গোলাম মোস্তফা হাসান
❖ দাওয়াত ও তাবলীগ (আরবি) - শায়খ মুহাম্মদ হাম্মাদ আবু মুসআব
❖ উমর পালনপুরির জীবনী (আরবি) - শায়খ মুহাম্মদ আলী আশ শারকাবি
❖ হায়াতুস সাহাবা (আরবি) - মাওলানা ইউসুফ কান্দালবি রাহ.
❖ দ্বীনি দাওয়াত (উর্দূ) - সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহ.
❖ আল এতেদাল (উর্দূ) - শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ.
❖ দরসে তিরমিযি ৫ম খণ্ড (উর্দূ) - আল্লামা তাকী উসমানি মা.আ.
❖ তাবলীগি জামাত (উর্দূ) - ড. আবদুর রাযযাক ইসকন্দর মা.আ.
❖ তাবলীগ কা মাকামি কাম (উর্দূ) - মিয়াজি মুহাম্মদ ঈসা রাহ.
❖ পাকিযা যিন্দেগি (উর্দূ) - মাওলানা মুহাম্মদ উমর পালনপুরি রাহ.
❖ এক কিমতি মশওয়ারা (উর্দূ) - মাওলানা সাঈদ আহমদ খান রাহ.
❖ তাবলীগ জামাতের সমালোচনা ও জবাব - শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ.
❖ সাওয়ানেহে হযরতজি (উর্দূ) মুফতী আযিযুর রহমান রাহ.
❖ মালফূযাতে হযরত ইলয়াস রাহ. (উর্দূ) - মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নুমানি রাহ.
❖ মালফূযাতে হযরত ইউসুফ (উর্দূ) - মুফতী মাওলানা রওশন কাসিমি
❖ তাবলীগ জামাতের কারগুজারি - মাওলানা তারিক জামিল
❖ মুনতাখাব হাদীস - মাওলানা ইউসুফ কান্দালবি রাহ.
❖ ফাযাইলে আমল - শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ.
❖ ফাযাইলে সাদাকাত - শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ.
❖ তাবলীগি তাহরীক (উর্দূ)
❖ তাযকিরায়ে মাওলানা ইউসুফ (উর্দূ)
❖ মকতুবাতে আকাবিরে তাবলীগ (উর্দূ)

সমাপ্ত

মাকতাবাতুল মা'আরিফ